চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা



সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত



With best Compliments of :











M/s. Durga Engineering Enterprise

14/2, Old China Bazar Street,

Room No. 8A. 1st. Floor

Calcutta-700001





Space Donated by :

A Well Wisher



বিদ্যালয়ে জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী ও মনোবিজ্ঞান

অমরেন্দ্র নাথ বসু *

বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যতালিকায় বিভিন্ন নতুন বিষয়ের সংযোজন হয়েছে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যাতে ছেলে-মেয়েরা একটি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, এই পাঠ্যতালিকায় এই প্রয়াসই প্রতীয়মান। এই সকল উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই জীবন-বিজ্ঞান (Life Science) নামক বিষয়টিকে এই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জীবন-বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচীতে মানুষ এবং তার পরিবারের প্রাণী জগতের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এদের শারীরিক গঠন, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণ, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায় পাঠ্যসূচীতে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই পাঠ্যসূচী বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রাণী জগতকে যেন একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হয়েছে। প্রাণী দেহ যেন একটা ভাবহীন যন্ত্রবিশেষ। একটা যে কোন জটিল ইঞ্জিনের সাথে যেন তার বিশেষ তফাৎ নেই। প্রাণীর যে একটা চিত্তবৃত্তির দিক রয়েছে, একটা মনের জগৎ রয়েছে, এই সত্যটি যেন অগোচর রয়ে গেছে। দেহযন্ত্র ও মনের মিলিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রাণের স্পন্দন অনুভূত—এ সত্যটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিষয়গত (objective) ভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রাণী জগতের বিভিন্ন স্তরে যেমন দেহ-যন্ত্রের বিকাশের তারতম্য রয়েছে, তেমনি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারতম্য রয়েছে মানসিকতার বিকাশের।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য তালিকা পুস্তকে (Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary

---

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

Education [Classes VI—X], From 1974, Vol. 1) জীবন বিজ্ঞান পঠনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, "To give pupils an intelligent and appreciative insight into the working of the life force in nature's kingdom." (P. 65) কিন্তু এই জীবনবেগ তো কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মনের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও এই জীবনশক্তির অভিব্যক্তি বিদ্যমান। কাজেই এই নতুন পাঠ্যতালিকায় জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার কোনও উল্লেখ না থাকা ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচীর পরিচায়ক। এই ত্রুটি অপনয়নের জন্যই জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় অতি সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত পুস্তকে প্রাণীর সংবেদনশীলতার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিষয়টি এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে মনে হয় যে সংবেদনশীলতা কেবলমাত্র উদ্দীপনা (stimulus) এবং প্রতিবেদন বা সাড়া (response) প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ stimulus→ response বা S→R formula) ; এই সংবেদনশীলতায় প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের যেন কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রাণী সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান আহরণ করতে হলে, অর্থাৎ সমগ্র প্রাণীটিকে জানতে গেলে, তার মানসিক প্রক্রিয়া-সমূহকে বাদ দিয়ে তাকে জানা সম্ভব নয়। মানুষ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের দৈহিক প্রক্রিয়া, তার আচার-আচরণ, তার প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে গেলে তার মনন ক্রিয়া এবং মানস প্রক্রিয়াসমূহকে বাদ দেওয়া চলে না। মানুষের আচর-আচরণ কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিবেদন সূত্রে (S→R) দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক উদ্দীপনার অনুপস্থিতিতেও মানুষের দেহ-যন্ত্র নানাভাবে আচরণ করে থাকে। বাহ্যিক উদ্দীপনার অভাবে দেহযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না। তার অভ্যন্তরে মনন বা চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, অন্তর্নিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াসমূহ চলতেই থাকে। এছাড়াও চলতে থাকে নানা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উত্থান-পতন এবং ভালবাসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ (emotion) সমূহের বৈচিত্র্যময় লীলা। এমন কি যে কোন দৈহিক প্রক্রিয়াও উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সূত্র ধরে প্রায়শঃই দেখা দেয় না। যেমন দৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ ধরা যাক। বহুদিন পরে কোন একজনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন দৃষ্টিপথে আবির্ভূত। কিন্তু সেই মুহূর্তে হাজার উদ্দীপক তার দেহযন্ত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রতিবেদনের জন্য আবেদন পাঠাচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেহযন্ত্রটি তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তার প্রতিবেদনকে কেবলমাত্র

একটি পথেই ধাবিত করে। সে তখন নয়ন ভরে তার প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাগত' কবিতায় নায়িকা দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর যখন তার কুঞ্জগৃহদ্বারে তার প্রিয়জনকে উপস্থিত দেখতে পেল, তখন সে কি কেবল তার দর্শন ইন্দ্রিয় দিয়ে একটি মানুষকে দেখেছিল ? তার আচরণ কি কেবল দৃষ্টি-উদ্দীপনা ও প্রতিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ? তা মোটেই নয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অঙ্কিত এই কবিতার চিত্ররূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে ঐ মুহূর্তে নায়িকার আচরণের মধ্যে কত রাগ-অনুরাগের, কত বেদনার কত সংযত প্রতিক্ষার স্মৃতি বিধৃত। এই মুহূর্তটি কত আবেগের রঙে রঙীন। তাইতো নায়িকা বলছে,—

"হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা,—মোর মনে নাই ক্ষোভ-লেশ,
নাই অভিমান-তাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায়,
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহ গুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রময় শুভ্রতায় লভে অবসান।" ইত্যাদি।

এ কি কেবলই দৃষ্টি উদ্দীপনার প্রতিবেদন ? কত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনুভূতি কত, ভাব, কত আবেগ, কত স্মৃতি সংগঠিত হয়ে এই প্রতিবেদনের সৃষ্টি। ঐ মুহূর্তে নায়িকার সকল সত্তা, সমগ্র শরীর-যন্ত্র এই প্রতিবেদনের অভিব্যক্তিতে নিয়োজিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের (এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরও) সংবেদনশীলতা কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিবেদন (S→R) সূত্রের উপর নির্ভর করে না। প্রতিবেদনের জন্য উদ্দীপকগুলিকে প্রয়োজন মত সংগঠিত (organise) করার ব্যবস্থাও তার মধ্যে রয়েছে। এই সংগঠন ব্যবস্থা ছাড়া প্রাণীর পক্ষে কোন প্রতিবেদন সম্ভব নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই সংগঠন ব্যবস্থা অধিকতর জটিল। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের আচার-আচরণের ব্যাখ্যায় পূর্বেকার উদ্দীপনা→প্রতিবেদন সূত্র (S→R formula) অচল। অধুনা এই ব্যাখ্যার কাজে উদ্দীপনা→সংগঠন→প্রতিবেদন সূত্র (Stimulation→Response formula ; S→O→R) সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। উদ্দীপনা সংগঠিত হয়ে প্রতিবেদনরূপে প্রকাশিত হয়ে প্রাণীকে তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে (প্রাণীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী)

সহায়তা করে। এইভাবে প্রাণীর ব্যবহারে ও পরিবেশে যে পরিবর্তন সাধিত হলো তা আবার নতুনভাবে উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করে। একে বলা চলে sensory feedback। প্রাণীর আচার-আচরণ এইভাবে তার সংগঠন ক্ষমতার সাহায্যে উদ্দীপনা→ সংগঠন→প্রতিবেদন→প্রতিবেদন সঞ্জাত উদ্দীপনা (sensory feedback), এই সূত্র ধরে চলতে থাকে (S→O→R→Sf)। যেমন, ধরা যাক একজন লোক কলকাতা শহরের কর্মব্যস্ত রাস্তা পার হচ্ছেন। ফুটপাত থেকে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। ডান পাশ থেকে হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ডান দিকে তাকালেন এবং গাড়ীটি দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্টো দিকে ঘুরে ফুটপাতে পূর্ব্বের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন এবং গাড়ীটি চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই সংগঠন প্রক্রিয়াকে আমরা মানসিক প্রক্রিয়া বলি বা অন্য নাম দিই, তাতে কিছুই আসে যায় না। আসলে এর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। এই সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাণীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মনোযোগ, চিন্তন, প্রক্ষোভ ইত্যাদি। কাজেই মানসিক প্রক্রিয়ার এই দিকগুলির উল্লেখ না করলে প্রাণীর আচার-আচরণ সঠিক এবং সামগ্রিক ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সেদিক থেকে স্মৃতি (memory), মনোযোগ (attention), চিন্তন (thinking), প্রক্ষোভ (emotion) ইত্যাদি বিষয়সমূহের অতি প্রাথমিক (elementary) উল্লেখ অবশ্যই জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এ না হলে মানুষের আচার-আচরণ ও প্রকৃতি এবং তার উৎস সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন কতগুলি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে, যার পরিণতিতে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। জীব-বিজ্ঞানের বর্তমান পাঠ্যসূচী এবং তা অনুসরণ করে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে তাতে এরূপ ভুল ধারণা গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকার ভূমিকায় আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "Life science is to be studied in the school with the idea to have a correct perspective of human being in relation to the environment as exemplified by the plants and animals. The common, as well as different, phenomena of life in relation to the structural and behavioural peculiarities are to be integrated in such a manner as to depict a com-

posite and corroborated picture in which man himself forms the central figure." আবার বলা হয়েছে, "The syllabus of the Life Science has been drawn with a view to teaching the students the use of sense organs as well as to develop the proper perspective of man in relation to other organisms and also in reference to environment in which he lives." মানুষ সম্বন্ধে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, মানুষের সাথে অপরাপর প্রাণীর মিল ও পার্থক্য সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মান প্রভৃতিই এই পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য। এখানে মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব কি? মানুষের আচরণের জটিলতা নির্ভর করছে তার জটিল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর। এখানেই মানুষের সাথে অপরাপর প্রাণীর প্রধানতম তফাত। জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে অর্ধেক মানুষকেই উপস্থিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ মানুষকে নয়। এ যেন জীবনহীন জীবন-বিজ্ঞান। গোড়াতেই যদি ছাত্র-ছাত্রীদের এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তাহলে তার ফল অতি মারাত্মক। কারণ পরবর্তীকালে এই বদ্ধমুল ভুল ধারণা সংশোধন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের ভুল ধারণার মধ্যে। মন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা না থাকলে মানসিক রোগকে শারীরিক রোগ বলে ধারণা করা, মনের রোগকে অপার্থিব বা আধিদৈবিক ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা স্বাভাবিক। তাই আমাদের দেশের লোক এই রোগের চিকিৎসায় দৈব ওষুধ, ওঝা ইত্যাদির সাহায্য নেবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যই এই দু'রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; কেউ কেউ মানসিক ক্রিয়াকে শারীরিক পর্যায়ে নিয়ে ফেলেন, আবার কেউ কেউ মনকে রহস্যাবৃত অপার্থিব ব্যাপার করে ফেলেন। এরূপ আচরণের মূলে যে মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। তাই শরীর-বিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন শরীর সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে তারা মন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, এটাই কাম্য। মানসিক রোগ চিকিৎসার বিকাশের মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের যে নিবিড় যোগাযোগ দেখা গেছে, বিশেষ করে শরীর যন্ত্রের উপর প্রক্ষোভ সমূহের যে অসামান্য প্রভাবের দিগন্তটি উন্মোচিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা

দানের ব্যবস্থা আলোচ্য পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই থাকা দরকার। শরীর ও মনের পরস্পর নির্ভরশীলতার দিকটি মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু উক্ত পাঠ্যসূচীতে এই দিকটি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে ইন্দ্রিয়স্থান (sense organ), নার্ভতন্ত্র (nervous system) এবং হরমোন (hormone) সম্বন্ধে প্রাথমিক পাঠ দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলির কার্যকারিতার সাথে মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ (যেমন প্রক্ষোভ, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদি) মিলেমিশে আছে। মানসিক প্রক্রিয়াসমূহকে বাদ দিয়ে উপরোক্ত শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই শরীরযন্ত্রের ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান দানের সাথে সাথে মানস-যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধেও জ্ঞান দান প্রয়োজন।

জড় বিজ্ঞানের সীমাহীন জয়যাত্রা মানুষকে নতুন একটা সমস্যার মধ্যে এনে দিয়েছে। দুটো মহাযুদ্ধ এবং আধুনিকতম মারণাস্ত্রের আবিষ্কার এই সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। কিভাবে মানুষ আজ পরস্পরের সাথে মিলে-মিশে বাস করতে পারে, একে অন্যকে কিভাবে আরো বেশি বুঝতে পারে এটাই আজকের বিশেষ সমস্যা। এই কারণেই আজ সারা পৃথিবীতে সমাজ-বিজ্ঞানের নানা শাখা, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। মানুষ তার নিজের এবং অপরের আচার-আচরণ বুঝতে চায়, নিজেকে এবং অপরকে জানতে চায়। এই জানার মধ্যেই তার নিরাপত্তাবোধ নিহিত। তাই আদিম যুগ থেকেই মানুষ প্রশ্ন করেছে, 'আমি কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে মানুষ ধর্ম, দর্শন, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারস্থ হয়েছে। মানুষ তার সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা, হিংসা-দ্বেষ, ভালবাসা, ঘৃণা, বুদ্ধি, চেতনা, স্বপ্ন ইত্যাদির নানা ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষ তার নিজের দিকে তাকাতে চেয়েছে। এই কাজে সে কখনও সাধারণ বুদ্ধি, কখনও কুসংস্কার, আবার কখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে। বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অপরিসীম বিকাশের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষ এখনও তার নিজেকে জানার ব্যাপারে নানা কুসংস্কারের ও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা সহজসাধ্য। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। স্বপ্ন সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারণা এখনও রহস্যাবৃত ; অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে স্বপ্ন একটা দৈব ব্যাপার, ভগবান দেখান, বা ভৌতিক কিছু ইত্যাদি। কাজেই মনোবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনীন। সকলের মধ্যে এই জ্ঞানকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে প্রত্যেকেই তার নিজের দিকে তাকাতে শেখে। যেমন শরীর সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই থাকা দরকার,

তেমনি দরকার মন সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান। এতে আমাদের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকা সহজতর হবে, সুখকর হবে। বিষয়গত (objective) ভাবে নিজের দিকে তাকাতে শেখানো, এটাই মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ। আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি এই মনোবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণী এবং বিবর্তন (evolution) সম্বন্ধেও কিছু কিছু পাঠ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও একটা মনের জগত আছে সেখানেও যে নানা অনুভূতি ও ভাবের সন্ধান মেলে, সেদিকেও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। কিন্তু পাঠ্যসূচীতে এদিকটিও অবহেলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশেষ (specialised) জ্ঞানদানের প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র এই দিকে যেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, জীব জগতের প্রতি যেন একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, এই ব্যবস্থা থাকা দরকার। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, তিনি উদ্ভিদ রাজ্যে ভাবময় জগতের যে সন্ধান দিয়েছেন, পাঠ্যসূচীতে তার উল্লেখ না থাকা নিশ্চয়ই ত্রুটিসূচক। জগদীশচন্দ্রের এত বড় দৃষ্টিভঙ্গীকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে কিশোর বয়সই উপযুক্ত সময়। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাই এর উপযুক্ত স্থান। জীবজগতের প্রতি মানুষের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী,—বিশেষ করে উদ্ভিদের সাথে মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক ভারতীয় চিন্তাধারায় বিধৃত, তা ভারতীয় চিন্তাধারার নিজস্ব আবিষ্কার; কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতায় যা প্রকাশিত, তা থেকে যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা বঞ্চিত না করি। এই দৃষ্টিভঙ্গীই বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর মধ্যেই সত্য নিহিত।

বিবর্তন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। শরীর যন্ত্রের বিবর্তন ও মানস-যন্ত্রের বিবর্তন একই তালে চলেছে। জটিল শরীর-যন্ত্রে জটিল মানস-যন্ত্রের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। আবার মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের একটা নতুন ধাপ পরিলক্ষিত হয়েছে, যাকে Hobhouse বলেছেন, "self conscious evolution" "Human evolution, ...is the work of man—the product of the being who evolves. Man does not stand outside his own growth and plan it. "(Mind in Evolution—Hobhouse ; 1901). কাজেই মানুষের প্রকৃতি ও আচরণের স্বরূপ বুঝতে গেলে বিবর্তনের এদিকটিও বিবেচনা করা দরকার।

এতক্ষণ যে সকল কথা বলা হলো তা কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো। তবে এই অনুযায়ী বিস্তারিত পাঠ্যসূচী গড়ে তুলতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি করতে পারেন। বিস্তারিত পাঠ্যসূচী তাঁদের সাহায্যেই রচনা করতে হবে।

সাঁওতালী বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন ও সমাজ-ব্যবস্থায় তার প্রভাব

ধনপতি বাগ *

সাঁওতালদের বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় 'বিচিত্র'। এর কারণগুলো এক এক করে বিবৃত করার চেষ্টা করব। তবে প্রথমেই একটু বলে রাখি—একদিকে বর্তমান জগতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশও মনে হয় এই ব্যাপারে এদের কাছে হার মানবে; আবার অন্য দিকে অতি সংরক্ষণশীল জাতিও এদের বিয়ের অনুষ্ঠানাদি দেখে তারিফ না করে পারবে না। এই দু'য়ের মাঝে আবার এমন কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো সত্যিই অভিনব। আরো আশ্চর্য লাগে, এই সবগুলি পদ্ধতিই সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। এর থেকেই মনে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা ওঠে যে, তাহলে এদের সেই সমাজ ব্যবস্থাটা কি প্রকারের? সেটাইতো আগে জানা দরকার। এই প্রশ্ন মনে রেখেই আমি পূর্ব-প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের † অবতারণা করছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেগুলি পড়লেই খানিকটা ধারণা করতে পারবেন। আশা করছি এদের বিবাহ-পদ্ধতিগুলি প্রকাশ পেলে আমি ঐসব প্রবন্ধে যা বোঝাতে চেয়েছি সেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে, ঐসব প্রবন্ধগুলিতে ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলনটাই ছিল মুখ্য। এবারে প্রধানতঃ বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন কোন দিকে কিভাবে এগোচ্ছে বা মোড় নিচ্ছে, তার মাধ্যমে সমাজের বুকে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেইটাই জ্ঞাতব্য।

বর্তমানে আট-দশ রকমের বিবাহ-পদ্ধতির চল রয়েছে দেখা যায়। এর মধ্যে যে পদ্ধতিটি সব চেয়ে বেশী মর্যাদা পেয়ে থাকে সেটার কথাই আগে বলব। হিন্দু বা মুসলমান যারা প্রাচীনপন্থী তাদের কাছে এই পদ্ধতিটিই বিশেষ গুরুত্ব পাবে। এই বিয়েতে সাধারণতঃ কথা-বার্তা শুরু হয় ঘটক বা ঘটকী মারফৎ। সাঁওতালদের মধ্যে পেশাদারী ঘটকের ব্যবসা এখন খুব মন্দা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওরা অনেক

---

* মনঃসমীক্ষক, বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

† "চিন্তা" তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮১, "চিন্তা" ১ম সংখ্যা ১৩৮২ ও "চিন্তা" ২য় সংখ্যা ১৩৮২।

কথাই বলবে। তার মধ্যে আমরা যাচ্ছিনা, ঘটকদার এসে খবর নেয় ছেলের বিয়ে দেবে কিনা। ওরা আগে ছেলের বাড়ীতেই খোঁজ করে দেখেছি। যদি ছেলের অভিভাবক রাজি থাকে তখন ঘটকদার তার ঝোলা থেকে একটি একটি করে মেয়ের ফর্দ বার করে। ঐসব শুনে ছেলের অভিভাবক যদি আগ্রহী হয়, তখন দেখা-দেখি, পছন্দ-অপছন্দের অধ্যায় শুরু হয়। এই অধ্যায়ের শেষে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট হয়। এটা ছেলের তরফ থেকেই প্রস্তাবিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'মনামনি'। নিয়ম অনুযায়ী এটি মেয়ের গ্রামের অনতিদূরে কোন বনে বা বাগানের মধ্যে, নির্জন পরিবেশে হবে। যেখানে উভয় পক্ষের কিছু কিছু লোক উপস্থিত থাকবে। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব বিষয়ে অগ্রণী। সঙ্গে যে দু'চার জন পুরুষ থাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। ভাবী বরই একমাত্র পুরুষ যার সমাদরের বহর দেখবার মত। অবশ্যই বর ও কনে উভয়কেই সমান সমাদর দেখানো হয়। বরের আদর সবচেয়ে বেশী কন্যাপক্ষের মেয়েদের কাছে, আর কনের আদর বর-পক্ষের কাছেই সর্বাধিক। উভয় পক্ষ থেকে যারা যারা আসে তাদের মধ্যে সাধারণতঃ থাকবে, কাকীমা, বৌদি, পিসিমা, বড়দিদি ইত্যাদি। এক এক পক্ষ থেকে আট-দশ করে আসবে।

প্রথমে বর-পক্ষ একটি পরিষ্কার জায়গায় বৃত্তাকারে বসবে। বৃত্তের একদিকে খানিকটা জায়গায় আনুষ্ঠানিক জিনিষ-পত্র রাখা থাকবে এবং ঐগুলির একদিকে খানিকটা জায়গায় আনুষ্ঠানিক জিনিষ পত্র রাখা থাকবে এবং ঐলির একদিকে বর ও একদিকে কনে, কিছু লোকের তত্ত্বাবধানে থাকবে। জিনিষ-পত্রের মধ্যে প্রধান মুড়ি এবং সরিষার তৈল বা 'সুনুম্'। একজন মহিলা বৃত্ত থেকে এগিয়ে এসে বসবে এবং এক হাঁটুর উপর ছেলেকে এবং অপর হাঁটুর উপর মেয়েকে বসিয়ে হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় তেল মাখিয়ে দেবে, এবং শেষে তাদের আঁচলে বা গামছায় কিছুটা মুড়ি ঢেলে দেবে। সবশেষে ঐ মহিলা বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে গলায় একগাছি করে মালা পরিয়ে দিয়ে। মালা ছাড়া নগদ টাকা-পয়সাও অনেকে আশীর্বাদী হিসাবে দিয়ে থাকে। এইভাবে উপস্থিত সকল মহিলাই বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে। এই অনুষ্ঠান শুরু হয় দ্বিপ্রহরে শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা লেগে যায়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে এতো সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও শোভন এবং রুচিসম্পন্ন অথচ অনাড়ম্বর; কিন্তু এতই হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে যে মুগ্ধ বিস্ময়ে

শুধু দেখেই মনটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবদম্পতির কল্যাণ-কামী হয়ে পড়ে।

এই অনুষ্ঠানটি যখন চলতে থাকে তখন উভয়পক্ষ গলা মিলিয়ে গানের লহর গেঁথে চলে। 'মনামনির'র পালা শেষ হলে উভয়পক্ষ মিলে বিয়ের তারিখ ঠিক করবে। এটা হোল প্রস্তুতি পর্ব। অবশ্য মনামনিতে রাজী হবার আগেই অভিভাবকরা লেন-দেনের ব্যাপারটা ঠিক করে নেয়। যেমন লেন-দেন সম্বন্ধে কথা বলার আগে ঠিক হয় জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি নির্ব্বাচন। এগুলিকে ধরলে 'মনামনি'কে তৃতীয় কি চতুর্থ পর্বও বলা চলে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, সাঁওতালদের বিয়েতে মেয়ের জন্য বরপক্ষ কন্যার পিতাকে কিছু অর্থ দেবে, এইটাই নিয়ম ; অর্থাৎ মেয়েকে কিনে নিতে হয়। এতে কন্যাকুল গৌরবান্বিত হয়। এই পদ্ধতিতে মোট বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা কন্যাপণ দিতে হয়। এই অর্থ থেকে পঞ্চাশ পয়সা কন্যার পিতা পঞ্চায়েতকে দেবে। এটা সম্মানী অর্থ। বাকিটা তার নিজের পাওনা। মেয়েকে কিনে নেওয়াতে কন্যাপক্ষ গর্বিত কিন্তু তাই বলে এই গর্ব্ব বা সম্মানের সঙ্গে ওরা টাকার অঙ্কটা বাড়ানো-কমানোর কথা চিন্তা করে না। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না ; তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এবং মেয়ে যে সমাজে সমাদৃত এই বোধটা ওদের খুব টনটনে। ওরা আমাদের বলে, "তোমাদের ছেলে তো তোমরা মেয়ের বাপের কাছে বিক্রি কর ; আর আমাদের মেয়ে ছেলের বাপকে কিনে নিতে হয়।

বিয়ের আগে 'লস্‌মিদা' (পাকা দেখা) বলে আর একটি অনুষ্ঠান ক্বচিৎ-কখনো হতে দেখা যায়। যথেষ্ট সম্পন্ন ঘর ছাড়া এই অনুষ্ঠান করে না, কারণ এতে খরচ অনেক।

এরপর প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিয়ের আগের দিন, ছেলের বাড়ী এবং মেয়ের বাড়ী উভয় জায়গাতেই। এই অনুষ্ঠানকে ওদের ভাষায় বলে "সুনুম্-সাসান" আক্ষরিক বাংলা 'তেল-হলুদ', আমরা যাকে বলি 'গায়ে-হলুদ'। এদের এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য আছে। এটা শুরু হয় সন্ধ্যার পর। সারারাত ধরে এই পর্ব্ব চলতে থাকে। তিনজন কিশোরীকে নির্ব্বাচন করা হয় এই কাজের জন্য, এদেরকে বলে "তিত্‌রী-কুড়ী"। প্রথমে পঞ্চায়েতের সব সভ্যদের খবর দিয়ে কনের বাড়ীতে আনা হবে। তাদের মধ্যে নায়েকে কে সর্বপ্রথম নির্বাচন করা হবে—এই 'তিত্‌রী কুড়ীরা' নায়েকের

পায়ে সরিষার তেল ও হলুদ (কাঁচা হলুদ বেটে) মাখিয়ে দেবে। এরপর এক এক করে পঞ্চায়েতের সব সভাদের অনুরূপ ভাবে তেল হলুদ মাখাবে। তারপরে গ্রামে যতগুলি পরিবার আছে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী আসবে তাদের প্রত্যেককে যথারীতি "সুসুম-সাসান" মাখানো শেষ হলে এই অনুষ্ঠানের শেষ হবে। ওদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে দিনের আলো দেখা দেয়।

বিয়ের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কন্যাপক্ষের বাড়ীতে শুরু হয় দেরীতে। তার সবিশেষ বর্ণনা পরে দেব। বরপক্ষের প্রথম অনুষ্ঠান ছেলের স্নান করানো এবং তার আনুসঙ্গিক আচার-বিচার সকালে শুরু হয়। এই অংশের সবিশেষ পরিচয়ও ঐ মেয়ের বাড়ীর অনুরূপ, তাই এর পরিচয়ও কন্যাপক্ষের সঙ্গেই এক সঙ্গে জানা যাবে। বরপক্ষের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আমি এখন শুরু করছি।

ছেলের গ্রাম থেকে বরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকজন পুরুষ। এর সংখ্যা কত হবে সেটা মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া আগেই হয়ে থাকে। গ্রামের বাইরে থেকেও লোক থাকবে, যেমন ছেলের মামা, ভগ্নীপতি, পিসে, মেসো ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিরা। ছেলের দাদাও অবশ্যই থাকবে। আর থাকবে ঘটক এবং নিতবর, যাকে ওদের ভাষায় বলে "লামৃতা"। আর একটি চার-পাঁচ জনার দল বাজনদারের দল, এরা বরযাত্রীদের আগে আগে বাজনা বাজাতে বাজাতে রওনা হবে। সাঁওতালী ভাষায় বরযাত্রীদের বলা হয় "ভারীয়োৎ" *

এই বরযাত্রীর দল নিজগ্রাম থেকে এমন সময়ে রওনা হয় যাতে কনের গ্রামে বিকাল নাগাদ পৌঁছোতে পারে। কন্যাপক্ষের গ্রামে পৌঁছে বরযাত্রীর দল গ্রামের খানিকটা দূরে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবে। ঢোল কাঁসর বাজিয়ে অবশ্য তাদের উপস্থিতির কথা কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেবে। ঐ গাছতলাটি হবে ভারীয়োৎদের সাময়িক ছাউনী।

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কিছু লোকের ধারণা আছে "ভারীয়োৎ" এ স্ত্রী পুরুষ উভয়ই থাকে। আমি এরূপ উল্লেখ একজন গবেষকের ছাপানো পুস্তকেও দেখেছি। কিন্তু আমি নিজে অনেক খোঁজ করেছি, বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন, শান্তি-নিকেতনের চারিধারের অন্ততঃ পনের ষোলটি সাঁওতাল গ্রামের কোথাও ঐ মতের সমর্থন পাইনি।

এদিকে বাজনার শব্দ পেয়ে কনের বাড়ীতে প্রস্তুত হবার জন্য ব্যস্ততা দেখা যাবে। একদিকে কনেকে প্রস্তুত করা, অন্যদিকে বরযাত্রীদের আহ্বান করা, স্ত্রী-পুরুষ দুই দল দুই দিকে যাবে। বরযাত্রীদের সমস্ত দলটায় পুরোভাগে থাকবে নিতবর সহ বর ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। তারপর নৃত্যরত বাজনদারদের দল চার-পাঁচজন। সবশেষে বাকিরা। দলটি গাঁয়ের মুখে এসে গেলে গাঁ থেকে কন্যা-পক্ষের লোক এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে; তাদের সকলকে গুড় ও জল খেতে দেবে। [এইখানে বলে রাখি, কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের একটা নকল যুদ্ধ (লাঠালাঠি) হতে দেখেছি।] এই সময়ে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ভারীয়োৎকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করবে। এর মধ্যে মেয়ের বাবা বর ও নিতবরকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে যাবে এবং বারান্দায় বা উঠানে পাতা পাটির উপরে বসাবে। এই সময়ে বেশ খানিকটা মজার ব্যাপার ঘটে।

কনের দিদিরা এই সময়ে বরের কাছে আসবে। তাকে তেল মাখাবে; তার মাথার উকুন বাছবে, তার মাথার চুল বেঁধে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে বরকে এবং বরযাত্রীকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবে। বাজনদাররা তাদের বাজনা ও নাচ চালিয়ে যাবে। তেল মাখানোর পালা শেষ হলে বরকে উঠানে এনে দাঁড় করাবে। তার মাথায় জল ঢেলে চান করাবে, কিন্তু চানের পর গা মোছাবে না, চুল আঁচড়াবে না। তবে তাকে হলুদ ছোপান একখানা মার্কিন পরতে দেবে এবং তার মাথায় একটা টোপর পরাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শোলার টোপর দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বরের বাড়ী থেকে আনা বিশেষ ধরণের কাপড় দিয়ে কোণাকৃতি করে টোপর গড়ে মাথায় পরাবে। এই টোপরকে ওদের ভাষায় বলে "শাড়াদড়হী"। বর কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে। এখন বরের পাশে কনের ছোট ভাইকে এনে দাঁড় করাবে। এরপর কনের ঘর থেকে একটা থালায় করে কিছু আতপ চাল আনবে। থালাটা বরের সামনে ধরবে। ঐ থালা থেকে বর ও কনের ভাই একমুঠো করে আতপচাল নিয়ে মুখে পুরবে এবং চিবোবে। এই সময়ে বরের ভগ্নিপতি বা পিসে বরকে কাঁধে নেবে এবং কনের ভাইটাকে কাঁধে তুলবে তার জামাইদাদা বা ভগিনীপতি। এরি ফাঁকে বর চিবানো চাল মুখ থেকে থু-থু করে কনের ভাইয়ের দুই গালে লাগিয়ে দেবে। কনের ভাইও তার মুখের চিবানো চাল বরের গালে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে কিন্তু সেইসময়ে তাকে তার জামাইদাদা সরিয়ে নেবে। বর রেহাই পাবে।

ইত্যবসরে একটি ঘরে কন্যাপক্ষের কিছু লোক এবং বরপক্ষের কিছু লোক ঢুকেছে। সেখানে তারা মদ খাচ্ছে, গল্প-গুজব করছে। ঐ ঘরে বরপক্ষ থেকে আনা

একটি ঝুড়ি এনে রাখা হবে। সেই ঝুড়িতে থাকে কনের জন্য একখণ্ড বস্ত্র। ঐ বস্ত্রখানি কন্যাপক্ষের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তাদের মন্তব্য সকলকে শোনাবে। বলাই বাহুল্য ঐ মন্তব্যগুলি বরপক্ষকে শোনাবার জন্যই বলা হয়। সবই সমালোচনামূলক মন্তব্য। ঠাট্টা তামাসার সুরটিই প্রধান।

ঐ বস্ত্রটি মেয়ে বিশেষ এক ধরণ করে পরবে। আঁচলটি কোমরে এমনভাবে গুঁজবে যাতে সেখানে একটি ঝুলন্ত ঝোলা মনে হবে। ঐ আঁচলে মেয়ের মা কিছুটা ধান ঢেলে দেবে। ঐ ঘরের মধ্যে (সাঁওতালদের সব মূল ঘরের মধ্যেই থাকে) এক প্রান্তে নিচু দেওয়াল ঘেরা একটু জায়গা থাকে, যাকে ওরা বলে "ভিতর"—সেই 'ভিতর'কে সামনে রেখে কনে দাঁড়াবে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসবে কিছুক্ষণ তারপর নিবেদন করার মত করে আঁচলের ধানগুলো মেঝেয় ঢেলে দেবে, উঠে দাঁড়িয়ে 'ভিতরে'র বোঙা-কে প্রণাম করবে। ঘুরে এসে উপস্থিত নিজের গুরুজনদের সকলকে জোহার করবে। সবশেষে যে ঝুড়িটা করে কাপড আনা হয়েছিল সেই ঝুড়িটাকে জোহার করবে। তারপর ওটাকে ডান পা দিয়ে স্পর্শ করবে এবং সর্বশেষ ঐ ঝুড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে এবং পা মুড়ে ঐ ঝুড়ির ভিতরে বসবে। এই অবস্থায় গায়ের কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেবে। কেবল দু'টি হাতের আঙুলগুলি দেখা যাবে। ডান হাতে একটি কাজল-লতা বা "কাজরাটি" ধরবে এবং বাঁ হাতে ঝুড়ির কানাটা ধরে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবে। ঐ কাজল-লতাটি এতক্ষণ হয় মেয়ের কোমরে গোঁজা ছিল, নয়তো মালার মধ্যে ঝোলানো ছিল। এতক্ষণে ঘরের মধ্যেকার কাজ শেষ হোল।

এরপর মেয়ের ভগিনীপতি কনেশুদ্ধ ঝুড়িটি তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবে; আজকের দিনটাতেই ছোটভায়ের স্ত্রীকে ছুঁতে দোষ নেই। ওদিকে বরের জনৈক ভগিনীপতি বা 'জামাইদাদা' বরকে কাঁধে চাপিয়ে নেবে। বর ও কনেকে এই অবস্থায় পাশাপাশি রাখবে। আগে থেকেই একটি ঘটিতে জল রেখে তার মুখে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। ঐ ঘটির মুখে আমপাতার বোঁটা ধরে কনে অন্যদের সাহায্যে (কেন না তখনো তার চোখ মুখ ঢাকা) বরের কাঁধে ছিটোবে। বর-ও ঐ পাতা দিয়ে ঘটির জল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এই সময়ে মুখের কাপড়টা কিছুটা শিথিল করা হয়। এরপর পাঁচটি শালপাতায় মোড়া সিঁদুরের একটি মোড়ক বরের বাবা ছেলের হাতে দেবে। বর ঐ মোড়কটি বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে ঐ হাতটি কনের মাথার উপরে রাখবে এবং ডান হাত দিয়ে মোড়কটি

খুলবে এবং বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুলের সাহায্যে একটু সিঁদুর নিয়ে প্রথমে একটু মাটিতে ফেলবে। দ্বিতীয়বার ঐ একইভাবে সিঁদুর তুলে কনের সিঁথির নীচের দিক থেকে শুরু করে টিকির কাছাকাছি টেনে দেবে। এইভাবে তিনবার সিঁথিতে সিঁদুর দেবে। বাকি যে সিঁদুরটুকু পাতায় থাকবে সেটুকু পাতাশুদ্ধ সিঁথিতে মাখিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাথায় "টুটুরি" অর্থাৎ ঘোমটা টেনে দেবে। ঐ পাতাটা বর হাতে ধরে থাকবে। অন্যরা ওটা ফেলে দেবার জন্য প্ররোচিত করবে কিন্তু সে ফেলবে না, পরন্তু বর ঐ পাতাটা তার বাবার হাতে দিয়ে দেবে।

এই পর্যন্ত যখন শেষ হোল তখন বরপক্ষের কুটুম্বদের এবং কন্যাপক্ষের গোষ্ঠিবর্গের ও কুটুম্বদের খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আজকের বিয়ে শেষ হতে এখনো একটি পর্ব বাকি আছে। সেটা এবারে বলছি।

ওদিকে যখন খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে-বাড়ী ব্যস্ত সেই সময়ে দেখা যাবে বর, কনে ও লামৃতা অন্য কয়েকজন সঙ্গী সহ গ্রামের 'কুলি'-তে' দাঁড়িয়ে আছে। এই পথে অপেক্ষমান আজকের সম্মানিত অতিথিদের কাছে মেয়ের মা জলের পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে। ঐ পাত্র থেকে জল নিয়ে প্রথমে জামাইয়ের পা ধুইয়ে দেবে; তারপরে ধোয়াবে নিজের নবপরিণীতা মেয়ের পা এবং সবশেষে তাদের ছোট্ট সঙ্গী নিতবরের পা। এর পর জলটা বদলে নিয়ে এসে ঐ তিনজনার মুখগুলিও পরিপাটি করে ধুইয়ে দেবে কনের মা।

তারপর আসবে দুটি ঠোলাতে গুড়। একটি ঠোলা (পাতার ঠোঙা) থেকে গুড় নিয়ে মা মেয়ে ও জামাইকে খাওয়াবে এবং অন্য ঠোলাটির গুড়টুকু খাওয়াবে লামতাকে। গুড় খাওয়ানোর পর জল অবশ্যই পান করানো হবে। এইখানেই শেষ নয়। এবারে তিনজনার পায়ে পরিপাটি করে তেল মাখিয়ে দেবে ঐ মা। তেল মাখানো শেষ হলে পাতায় মোড়া সিঁদুর নিয়ে তিনজনকে তিন ভাবে সিঁদুর পরাবে। তারপর একটা কাঁচা শালপাতার থালায় করে আগুন আসবে এবং ঐ সঙ্গে একটা মোটা কাঠের খেঁটে বা ডাণ্ডা। এই মোটা ডাণ্ডাটির একপ্রান্ত একহাতে ধরে আগুনের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রান্তভাগটা আগুনে তপ্ত করবে, অন্য হাতের চেটোটা "আদাব" করার মতো করে নিজের কপালের সামনে তুলবে। পরের বারে অন্য হাতে ডাণ্ডাটি ধরবে এবং আগুনের চারধারে ঘোরাবে ও গরম করবে ও অপর হাতটা দিয়ে "আদাব" এর অনুরূপ আচরণ করবে। এমনি করে পাঁচবার কনের সামনে এবং পাঁচবার

জামতার সামনে অনুষ্ঠান করবে। শেষবারে ডাণ্ডাটি আগুনে ঠেকিয়ে পাশে রেখে দেবে। এই ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়েছে এটি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাবিশেষের আশীর্বাদ করার একটি পদ্ধতি। সকলের এতে অধিকার নেই। যাদের আছে এবং যাদের ইচ্ছা আছে তারাই এইসময়ে এখানে উপস্থিত থাকে। এরা সারাদিন ধরে এখনো উপবাসী। এই অনুষ্ঠান শেষ করে তবে এদের ছুটি। কনের মা ছাড়া বড়দিদি, কাকীমা-পিসিমা প্রভৃতিরা অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের অধিকারী।

এই অনুষ্ঠান শেষে বর কনের দিদির বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা ধরবে, দিদি তখন তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবে। কনে ও জামৃতা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকবে। ঘরে ঢুকে দিদি একটি জলভর্তি ঘটি হাতে তুলে নেবে এবং ঘরের মধ্যে গোল হয়ে তিনপাক ঘুরবে। ঘোরার সময় মাঝে মাঝে একটু একটু করে জল ঘটি থেকে ফেলবে মেঝেয়। তারপর মেঝেয় পাতা তালাই বা চাটাইয়ে সকলে বসবে এবং সকলকে মদ বা হাঁড়িয়া পরিবেশন করা হবে। এই আনুষ্ঠানিক মদ খাওয়ানোর পর ওদের ভাত-তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। খাওয়া শেষে বর ও নিতবর বাইরে বেরিয়ে যাবে। কনে থাকবে ঘরের ভিতরে।

এই সময়ে বাইরে শুরু হবে নাচ, গান, বাজনা। উপস্থিত কিশোরী ও যুবতীরাই বিশেষ করে এই নাচ গানে মাতে। যুবকরা বাজায় বাজনা। অনেক সময় তারা কনেকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে দেয়।

এই নৃত্য পর্ব শেষ হলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। সূর্যোদয়ের আগে বর-কনের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

বিয়ের প্রথম দিনের শুরু; প্রথমেই জানিয়ে রাখি বিয়ের প্রারম্ভে বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতে একই রকমের আচার-অনুষ্ঠান হয়, বিশেষ কোন ভেদাভেদ নেই। কনের বাড়ীতে তার আত্মীয়-স্বজনরা কুশীলব, ছেলের বাড়ীতে বরের আত্মীয়-স্বজনরা, এই যা তফাৎ। অনুষ্ঠানের উপকরণাদি সবই এক। উদ্দেশ্য তো বটেই। এজন্য আমি কেবল একটা বাড়ীর অনুষ্ঠানই—ধরুন মেয়ের ঘরের—কিভাবে ঘটছে সেইটাই বলব। পাঠক অন্য বাড়ীর অর্থাৎ ছেলের ঘরের ঘটনাগুলো কল্পনা করে নেবেন। একান্ত দরকার যেখানে হবে সেখানে অবশ্যই বিশেষ করে উল্লেখ করব।

মেয়ের বাড়ী অনুষ্ঠান শুরু হয় দেরীতে। বরযাত্রী গ্রামপ্রান্তে পৌঁছবার সাড়া পেলে তখন কনেকে প্রস্তুত করার জন্য সাড়া পড়ে যায়। বিয়েতে পুরোহিতের করণীয় কিছু নেই। অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানে আমরা পুরোহিতের যে ভূমিকা দেখেছি

এখানে সেই অনুপাতে বিয়ের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যৎসামান্য। দরকারী ভূমিকা যে টুকু আছে তা হোল জগ্-মাঝির। জগ্-মাঝি একজন পঞ্চায়েৎ সভ্য, মাঝি বা সর্দারের ডান হাত। বিয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শ নিয়ে ঠিক হয়েছে, সকলেই জানে। আগের দিনে তেল-হলুদ অনুষ্ঠানে তো সেটি সর্বতোভাবে পাকা হয়ে গেছে। তবু বিয়ের ভিন্ন কোন অনুষ্ঠান শুরু করার আগে জগ্-মাঝির কাছে আর্জি পেশ করতে হবে: অনুমতি করুন আমরা মেয়েকে চান করাব।

এই চান করানো অনুষ্ঠান হবে "বাগড়ী-"তে, অর্থাৎ কনের বাপের বাড়ীর বাস্তু-সংলগ্ন বাগানে। অনুমতি পেলে উপস্থিত সকলে একদফা মদ বা হাঁড়িয়া খেয়ে নেবে এবং বাগ্ড়ীতে গিয়ে পুরুষরা একটা খাল কাটবে। মেয়েরা নাচতে শুরু করবে। মেয়ের বাবা, মা এবং ঐ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বাগ্ড়ীতে যাবে। স্ত্রীলোকদের দলে মোট পাঁচ জন (বেশীও হতে পারে, তবে সংখ্যা বিজোড় হতে হবে) ঐ খালটিকে প্রদক্ষিণ করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ গর্তের মধ্যে জল ঢালবে তাদের হাতের ঘটি থেকে। ঐখানে একটি তীর, একটি লম্বাটে ধারাল অস্ত্র—ওদের ভাষায় এর নাম—"ত্যাভোয়াড়ী"—আমাদের ছোট আকারের খাঁড়ার অনুরূপ, এবং একটি ঘটি এক জায়গায় রাখা থাকবে। প্রত্যেক এক একটি জিনিষ নিয়ে প্রথমে আকাশের দিকে দেখাবে পরে নীচে ঐ খালটির দিকে দেখাবে, তারপর যথাস্থানে রেখে দেবে।

এদিকে জগ্মাঝি খালটা ঘিরে তিনটি জামের ডাল পুঁতবে এবং ঐ জামের খুঁটি ঘিরে খানিকটা সাদা সুতো জড়াবে। খালের পাড়ে মাটিতে এক জায়গায় সিঁদুর লাগাবে। একটা বড় কাঁসার বাটিতে এক বাটি মদ ও কয়েকটা শালপাতার তৈরী পাত্র (ঠোঙা) আনবে। একটি ঠোঙাতে মদ ঢেলে ঐস্থানে বোঙার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে। বাকি মদটুকু উপস্থিত পুরুষরা ভাগ করে খাবে। মদ খাওয়া শেষ হলে খুঁটি থেকে ঐ সুতোটা খুলে নেবে।

এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত "তিত্রি-কুড়ীরা" দু'টি মাটির কলসি নিয়ে আসবে। ঐ কলসির মধ্যে কিছুটা মুড়ি ও কয়েকটা করে পয়সা থাকে। জগ্মাঝি ঐ কলসি দুটি ওদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে এবং কলসি মধ্যস্থ মুড়ি ও পয়সা ওদের দিয়ে দেবে। কলসি দুটিতে জল ভর্তি করে জগ্মাঝি মাটিতে বসিয়ে দেবে। তিন জন "তিতরি-কুড়ী"র মধ্যে দু'জন কলসি দু'টি সামনে নিয়ে মাটিতে বসবে। তারপর প্রথমে হাঁটুর উপরে কলসি দুটি তুলবে,

সেখান থেকে তুলবে মাথায় এবং আবার মাটিতে নামাবে। আবার আগের মত করে মাথায় তুলবে এবং উঠে দাঁড়াবে।

এই অনুষ্ঠানে জগমাঝি পায় একখণ্ড পাঁচগজের মার্কিন কাপড়। এই কাপড়টি ভাঁজ করে সে কিশোরীদের মাথার উপরে জলভর্তি কলসি দুটির মুখ ঢেকে দেবে। তখন কিশোরীরা ঐ কলসী নিয়ে কনের বাড়ীর উঠোনের দিকে যাবে; যেখানে গতকাল শালের ডাল দিয়ে ছোট্ট একটা ঘেরা জায়গা করা আছে যেটাকে সাঁওতালী ভাষায় বলে "মাণ্ডোয়া", সেখানে কলসি দুটো নামিয়ে দেবে। দুজন মাত্র এই কাজটা করলেও থাকবে কিন্তু ওরা তিনজন। ওদের আরো কাজ আছে।

এই "তিত্‌রি-কুড়ী" রা এবার কনেকে তেল মাখাবে। ওদের তেল মাখানো শেষ হলে কনের মা আবার মাখাতে বসবে। ইতিমধ্যে পুরুষরা একটি গরুর জোয়াল ঐ বাগড়ীতে খালের উপর আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে আসবে। তেল মাখানো শেষ হলে কনেকে বাগড়ীতে নিয়ে যাবে। কনের মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরাও বাগড়িতে যাবে। ঐ খালটির একদিকে কনে, তার মা ও তার বাবা এক লাইনে দাঁড়াবে। বাঁ-দিক থেকে প্রথমে বাবা, মধ্যে কনে এবং দক্ষিনে মা। মা ও মেয়ে বসবে, বাবা দাঁড়িয়েই থাকবে। এবারে বাবা পূর্বোল্লিখিত খাঁড়া বা বগি বা "তাড়োয়াড়ী" খানা তার মাথার উপরে তুলে ধরে থাকবে, মা ও মেয়ে জোড় হাত করে বসে থাকবে। জগমাঝি খঁড়ার উপর জল ঢালতে থাকবে, ঐ জল কনের মা ও কনে আঁজলা ভরে খাবে এবং হাত দুটো মাথায় মুছবে। এরূপ একবারই করবে, এরপর বাবা ও মা স্থান ত্যাগ করবে। তাদের জায়গায়, তাদের স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন স্বামী-স্ত্রী অনুরূপ-ভাবে আচরণ করবে। এইভাবে মা-বাবার ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একের পর এক অনুরূপভাবে কাজ করে যাবে। এই পর্ব শেষ হলে কনে ও তার দিদিরা ও "তিতরি-কুড়ীরা" ছাড়া আর সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করবে। দিদিরা পূর্বোল্লিখিত দুই কলসি জলের একটি কলসি আনবে। কনেকে খালের উপরে পাতা জোয়ালের উপর দাঁড় করাবে এবং ঐ কলসির জল দিয়ে কনেকে চান করাবে। দরকার হলে পরে অন্য পাত্রের জলও নিতে পারে। এরপর কনেকে তার বাড়ীর দেওয়া পাড়ওয়ালা একখানা নতুন শাড়ী পরাবে। এরপর "তিতরি-কুড়ী"দের প্রস্থান। কনে থাকবে দাঁড়িয়ে। আসবে জগ্‌মাঝি। ঐযে আগে খানিকটা সাদা সুতো তিনটে খুঁটি ঘিরে লাগিয়েছিল সেই সুতোটাই দণ্ডায়মানা

কনের বাঁ-পায়ের (আঙুলের) থেকে শুরু করে কান বেড়িয়ে তিন-চার বার ঘুরিয়ে বাঁধবে —লম্বভাবে সুতোর খি-গুলো থাকবে।

"তিতরি-কুড়ী"দের পুনঃপ্রবেশ, হাতে কিছু আতপ ধান ও আমপাতা। ওরা তিন-জনই জগ্‌-মাঝির নির্দেশমত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙুলের নখের সাহায্যে খুঁটে-খুঁটে আতপ চাল বার করে আম পাতাতে রাখবে। জগ্‌-মাঝি ঐ চালের সঙ্গে ছোট এক টুকরো কাঁচা হলুদ যোগ করে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে মুড়বে এবং কনের পা থেকে কানের সঙ্গে যুক্ত ঐ সুতোটা খুলে নিয়ে এই আমপাতার মোড়কটা পরিপাটি করে বাঁধবে। সব শেষে ঐ মোড়কটি কনের ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে দেবে। এইটা মেয়ের হাতে সাধারণতঃ চার-পাঁচ দিন থাকে। সময় হলে শ্বশুর বাড়ীর জগ্‌মাঝি আবার খুলে দেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বরের হাতে অনুরূপভাবে ঐরূপ একটি মোড়ক বাঁধা হয়েছে। সেই অবস্থায় বর বিয়ে করতে এসেছে। সেটিও সময়মত ঐ একই দিনে খোলা হবে।

এতদূর হলে মেয়ে বিয়ের কনে হিসাবে প্রস্তুত হোল !

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

এখন মেয়ের বাড়ীতে দ্বিতীয় দিনে কি ঘটছে দেখা যাক্। এখানে বলে রাখি দ্বিতীয় দিনে ছেলের বাড়ী তো প্রায় ফাঁকাই থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। বর-কনের ফিরতে সেই বিকাল। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর যেটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায় সে কথা যথা সময়ে বলব।

দ্বিতীয় দিনে কনের বাড়ীতে বিদায়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাই বলে কোন করুণ দৃশ্যের অবতারণা করতে দেখা যায় না ; অন্ততঃ ঘরের বাইরে তো নয়ই। বাইরে বরং উল্টোটাই ঘটে। সেই কথাই এখন বলব।

অতিথিরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে মাণ্ডোয়ার ধারে কাছে এসে জমতে থাকবে। সকলে এসে পৌছোলে প্রথমেই তাদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। একদিকে যখন মদ বা হাঁড়িয়া পান চলে অন্যদিকে তখন বিচিত্র ধরনের প্রসাধন দ্রব্যাদি এসে জমা হয়। এই দ্রব্যগুলি হোল : ছোট একটি আয়না, চিরুণী, সিঁদুর ও হাঁড়ির ভুষো কালি দিয়ে তৈরী কাজল ইত্যাদি। সাজবে কনের মা বাদে স্ত্রী-কুলবতীরা। মদ্যপানান্তে

অপেক্ষমান অতিথিদের সামনে বটপাতা (শালপাতা নয়) থেকে তাকে হাঁড়িয়ার গাদ (যা গরু-বাছুরের খাদ্য) খানিকটা করে পরিবেশন করা হবে। পান করার জন্য জল দেবে এমন ফুটো পাত্রে যাতে জলটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে অতিথির গায়ে পড়ে। এরপর বিচিত্র সাজে চিত্রিতা কুলবতীরা এক এক জন করে কুটুমদের সামনে আবির্ভূতা হবে। প্রথমে যে সক্রিয় হবে তার বাঁ কাঁধে থাকবে একটি ভেড়ার শিশু। এই শিশুটি বিচিত্র পরিবেশে খুব সম্ভবতঃ প্রবল আপত্তি জানাবে, অর্থাৎ কাঁদবে। কুলবতী অতিথিদের সামনে গিয়ে যথারীতি জোহার করবে, জনে জনে। চলে আসবার আগে হঠাৎ ঘুরে কোন এক অতিথির সামনে এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে—বাচ্চাটা কাঁদছে একটু কোলে নিতে পার না? এই বলে তার দিকে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দেবার ভান করবে। অট্টহাসিতে চারদিক ফেটে পড়বে। অথ প্রথমার নির্গমন !

এরপর ঢুকবে দ্বিতীয়া। সারিবদ্ধ অতিথিদের এক এক জনকে সে জোহার করে যাবে। প্রত্যেক অতিথি প্রতি-জোহার করবে তাদের মাথাটা সামনে একটু নত করে। ঐসব কুটুমদের মাথায়, প্রায় সকলের, ধবধবে সাদা কাপড়ের পাগড়ী (?) বাঁধা থাকে। কুলবতীর তাক থাকে ঐসব পাগড়ীর দিকে। উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্য জানে সেজন্য তারা সজাগ থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন কোন কুটুম তার কুটুম্বিনীর কাছে ধরা পড়ে যায় তখন তার সাদা উষ্ণীশের দুরবস্থা দেখে আর একবার হাসির চোটে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। কুটুম্বিনীর মুখের যত কালিমা, কুটুমের ফুলের মত সাদা কাপড়ের গুণে পরিষ্কার হয়ে যায়। এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে একের পর এক ঠাট্টা-তামাসা—হাসি মস্করার অভিনয়।

কিছুক্ষণ পর আবার দৃশ্য বদলাবে। এবারে অভিনেত্রীরাই উপস্থিত সকলকে (বর ও কনে বাদে) হাঁড়িয়া বা হণ্ডি পরিবেশন করবে, নিজেরাও পান করবে। পানপর্ব শেষ হলে আবার পরবর্তী কাজের জন্য এগিয়ে যাবে। অতএব, এই সময়টুকুকে বিশ্রাম বলা চলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল কনের বাবা একটা কুলোতে করে কিছু আতপচাল, সিঁদুর ও একঘটি জল ম্যাণ্ডোয়ার পাশে এনে রাখতে। আজকের জন্য যে খাসিটা মেয়ের বাবা নির্দিষ্ট করে রেখেছে সেইটা আনবার জন্য একজনকে আদেশ করবে। ওটা আনলে খাসিটাকে কিছু আতপচাল খাওয়াবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি সাঁওতালরা

হিন্দুদের মত হাঁড়িকাঠ পেতে ছাগল কাটে না, এমনি জমিতেই কাটে। যে জায়গায় কাটবে সেখানে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দেবে; খাসির কপালেও সিঁদুরের টিপ দেবে। ম্যাণ্ডোয়ার পাশে বসা দুজন লোকের মধ্যে একজন বরযাত্রী। ঐ বরযাত্রী পাশে রাখা খাঁড়া বা বগিটা নিয়ে খাসিটা কাটবার জন্য উঠে দাঁড়াবে। খাঁড়া মাথার উপরে তুলবে কিন্তু খাসির স্কন্ধে সে খাঁড়া নামবে না। সে বলি দেওয়ার অভিনয় করবে মাত্র। আসলে খাসিটা কাটবে পূর্ব নির্ব্বাচিত কনের ঘরের একজন। বলি শেষে কনের বাবা বলিস্থানে টাটকা রক্তের উপর একটু মদ ঢেলে দেবে। পাত্রের বাকি মদটুকু উপবিষ্ট দুই ব্যক্তিকে পান করতে দেবে। তারা মদ খেয়ে খড়ের নুটি দিয়ে, ঘষে-ঘষে বলির রক্তটা তুলে ফেলবে। তোলা হলে ঐ নুটি দুটি যে যার বগলে চেপে রেখে পরস্পরকে জোহার করবে।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যাবে কন্যাপক্ষের জনৈকা কিছু আতপচালের গুঁড়ি দিয়ে ম্যাণ্ডোয়ার এক পাশে একটা লাইন আঁকল। সেখানে একটা তালাই বা চ্যাটাই পাতল। সেই চ্যাটাইয়ের মধ্যিখানে বর-কনে ও লামৃতাকে বসাল। একপ্রান্তে বসল ছেলের ভগিনীপতি ও অপর প্রান্তে বসল মেয়ের দিদি। এটা হোল আশীর্বাদ করার জন্য প্রস্তুতি।

এখন বরপক্ষ থেকে আগের দিন যে ঝুড়িটা এসেছিল সেইটাতে করে আতপচাল ও দূর্বা আসবে। ঐ ঝুড়িটি একপাশে থাকবে। ওদিকে আশীর্বাদ করার যোগ্য ব্যক্তিরা ও দর্শকবৃন্দ এই দুই দল অপেক্ষমান। আশীর্বাদকদের মধ্যে থেকে এক একজন উঠে আসবে এবং ঐ ঝুড়িটা দুহাতে তুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা আতপচাল ও দূর্বা বর-কনে ও লামৃতার মাথায় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে। প্রত্যেকে আশীর্ব্বাদ শেষে সামনে রাখা থালাতে কিছু অর্থ উপহার রাখবে। তারপর পাশে রাখা একটি বাতিতে (কেরোসিনের ডিবা) নিজের তালু দুটি উত্তপ্ত করে সেই তাপ বর-কনে ও লামৃতার দুই গালে স্পর্শ করাবে। একই ভাবে উভয়পক্ষের যত জন আশীর্ব্বাদক আছে তারা সকলেই অনুরূপভাবে আশীর্বাদ করবে। এই পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগে।

এর পর শুরু হয় ভোজন পর্ব। এদের চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে গ্রামের সমস্ত লোককে কুটুমদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়ে মদ ও ভোজ খাওয়ানো। কি ছেলের বিয়েতে, কি মেয়ের বিয়েতে এই নিয়মই বহু দিন ধরে চলে আসছে। এদের গ্রামগুলি সাধারণতঃ ছোট-ছোট। খাদ্যতালিকাতেও আড়ম্বর থাকে না। সেজন্য বিশেষ অসুবিধা

দেখা যায়নি। কিন্তু আজকাল কিছু-কিছু অসুবিধা দেখা গিয়েছে। সেকথা পরে বলছি।

এই ভোজে থাকে ভাত আর "ইতু" অর্থাৎ তরকারি। আর ঐ যে খাসিটা কাটা হোল, সেই মাংস। গ্রামের লোকসংখ্যা যাই হোক, ভাগে যতটুকু পড়ে তাতেই সকলে খুশী। পেট ভরার থেকে সম্মানটাই বড়। পেট ভরবার মত ভাত-তরকারির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে। বর-কনেকে কিন্তু খাসির মাংস খাওয়াবে না। তাদের আলাদা করে বসিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াবে আজ।

একটু আগে উল্লেখমাত্র করেছি যে, ভোজ খাওয়ানোর ব্যাপারে আজকাল কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেইটাই এখানে একটু বিশেষ করে বলে রাখি। বিয়েতে সামাজিক নিয়ম যেমন বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ গ্রামবাসীদের খাওয়াবে, তেমনি এও নিয়ম যে গ্রামস্থ প্রত্যেক পরিবার বিয়ে-বাড়ীতে এক কলসী মদ উপহার হিসাবে কনের বা বরের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে এরূপ লেন-দেন নিয়ম হিসাবে বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু আজকাল অনেক বিয়েতে কন্যা বা বরপক্ষ থেকে ভোজ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও সবটাই যে তাই-ই তা হলপ করে বলা যায় না। কারণ যাই হোক, এই লেন-দেন প্রচলিত থাকাকালীন বিয়ের ব্যাপারে যে সহযোগিতা, বিশেষ করে যে একাত্মতাবোধ ছিল সেইখানে ঘাটতি দেখা দিতে বাধ্য।

কোন কোন গ্রামে নাকি শোনা গেছে, যদি ভোজটাই বাদ যায় তবে মদটাই বা আমরা দিই কেন? আমরা ঘরে ঘরে মদ রাখব এবং আমাদের ঘরে বসেই মদ খাব। গত বছরে আমি নিজে এরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে শুনেছি। এরূপ মনোভাব বিস্তৃতি পেলে সাঁওতালী সমাজ-ব্যবস্থা রসাতলে যেতে বেশীদিন সময় লাগবে না। এই ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানীদের অবহিত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক দিকটার কথা আমি পরে বলছি।

ভোজ শেষে কন্যা বিদায়ের পালা। বরপক্ষ বাড়ী ফিরবার জন্য প্রস্তুত। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি বরযাত্রীদের অনেকেই যারা নিছক বরযাত্রী হিসাবে এসেছিল, অন্য কোন অনুষ্ঠানে যাদের করণীয় কিছু ছিল না, তারা কেউ কেউ রাত্রেই এবং অনেকে পরের দিন সকালেই চলে গিয়েছে। কাজেই বরযাত্রীর দল এখন ছোট হয়ে গেছে। তারা বাড়ী ফেরার তাড়া লাগাবে যাতে সন্ধ্যা হবার আগেই গাঁয়ে ফিরতে

পারে। কন্যাপক্ষও তাড়াতাড়ি বিদায়ের পালা শেষ করতে সচেষ্ট। এই পালা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি ঘটনাতে বেশ অভিনবত্ব আছে, সেইটাই এখন বলছি।

নবপরিণীতা কন্যা, স্বামী ও তার নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে তার নতুন গৃহে যাবে। চারিদিকে একটা করুণ আনন্দের হিল্লোল চলছে। এরি মধ্যে দেখা গেল কনের মা ও মাতৃস্থানীয়রা যাদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তারা একান্তে যেন কিসের জন্য অপেক্ষমানা। ইত্যবসরে বাপের দিক থেকে কন্যা এল, গেল প্রথমে মায়ের কাছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার মুখে যেন একটা কি রয়েছে। মেয়ে কি মার বুকে মুখ রেখে কাঁদছে? না। আসল ঘটনাটা হোল: মেয়ের মুখে থাকে একটি টাকা। একে ওদের ভাষায় বলে "নুনু-টাকা"। মেয়ে মায়ের স্তনটি ঠোঁট দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরবে যাতে তার মুখ থেকে টাকাটা মাটিতে পড়ে যায়। এইভাবে মেয়ে মাতৃস্থানীয়া সকলের কাছে যাবে এবং অনুরূপ আচরণ করবে। অতীতে মাতৃস্তন্য পান করার মূল্য দিয়ে গেল কি মেয়ে? জানি না। আরো একটু পরে বলছি।

অনুরূপ দৃশ্য দেখা যাবে ছেলে যখন বিয়ে করতে আসবে। রওনা হবার আগে পুত্র একটি টাকা মুখে পুরে মায়ের স্তন যখন ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরবে তখন মুখের টাকাটা মাটিতে পড়ে যাবে। এই সময় মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে: ওকাতেম চালা কানা বাবু? (কোথায় যাচ্ছ বাবা?) ছেলে উত্তর দেবে; কাসি বাগি কাতে কডমি আগু। (তোমার কাজ করতে কষ্ট হয়, তাই বৌ আনতে যাচ্ছি)।

মায়ের কাছ থেকে ছেলে তখন অপেক্ষমানা মাতৃস্থানীয়া অন্যদের কাছে যাবে এবং মুখে "নুনু-টাকা" নিয়ে তাদের প্রত্যেকের স্তন স্পর্শ করবে এবং অনুরূপ কথোপকথন হবে।*

সাঁওতালী মা কিন্তু ফুটফুটে মেয়েকে প্রশ্ন করে না। তবে ঐ সময়ে ছোট-বড় উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যে গানটি গায় সেইটিতেই মায়ের মনের কথার অনেকখানিই বলা হয়ে যায়। সেই গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি:

সাঁওতালীতে—"তিনে ঝোলচুকু ইদিমিএা দুলোড়ে
আম চালা আদম লেএ টুইমে
দেন গো তোয়াদারি নিনুতোয়াইএ।

---

* হিন্দু মা পুত্রকে বলে, বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ? পুত্রের উত্তর: তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি। কনের বেলায় কনকাঞ্জলির কথা স্মরণীয়।

ভাবার্থ বাংলায়—মা কত দূরের পথ যেতে হবে তোকে
জানি না ; আমারে তুই বলে যা
মা, তোরে কি আর দিব পাথেয়
একটু বুকের দুধ খেয়ে যা।

সাঁওতাল মেয়ের মা মেয়েকে বিদায় দেবার আগে তার আঁচলে কিছু মুড়ি দেয়, মেয়ে কিন্তু সেই মুড়ি তার "কয়মুভার" বা বন্ধুর আঁচলে ফিরিয়ে দেবে। এইভাবে তিনবার দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেলে বন্ধুর আঁচলেই সে মুড়ি থেকে যাবে। কিন্তু এই আচারকে বাক্যবন্দী করার কোন খবর আমি আজো পাইনি।

বর-কনে নিয়ে উভয়পক্ষের লোক মেয়ের গ্রাম ছেড়ে এবারে বেরোবে। মেয়ের গ্রাম থেকে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও যায়। সঙ্গে কম বয়সের ছেলে-মেয়েও দু-চার জন থাকে, কোন বাধা বা বাধ্যকতা নেই এতে। সাধারণতঃ বিশ-তিরিশ জন লোক যায়। ছেলের গ্রামে পৌঁছে গেলে সর্বপ্রথমে কুটুমের দলকে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মদ খাবে। বরপক্ষের কিশোরীরা উপস্থিত কন্যাপক্ষের সকলের পা ধুইয়ে, তেল মাখিয়ে তাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। তারপর তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোয়ালের মধ্যে চ্যাটাই পেতে বসাবে। এবারে বরের মা-বাবা আসবে। তারা কন্যাপক্ষের ছোট-বড় সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। তারপর আসবে বর স্বয়ং। সেও উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। এটা হোল প্রাথমিক অভ্যর্থনা। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি।

এরপরে শুরু হবে বরের আশীর্বাদী সভা। বর ধুতি-জামা পরে হাতে শালপাতা দিয়ে তৈরী একটি থালার উপরে এক ঘটি জল বসিয়ে নিয়ে উপবিষ্ট সকলের সামনে রেখে আবার সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান এগিয়ে এসে ছেলেকে নিজের উরুর উপরে বসাবে। একটা মার্কিন তার মাথায় বেঁধে দেবে। বর উরুতে বসার আগে এক পাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে এবং উঠে আসবার পরে আবার একপাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে। একইভাবে উপস্থিত আশীর্বাদকরা কাজ করবে এবং বরও অনুরূপ ব্যবহার করবে। তবে উপস্থিত সকলে কাপড় দিতে পারে না, তাই তারা আশীর্বাদের সময় হাতে একটি টাকা দেয়। আবার যারা টাকার থেকেও কম দেবে তারা তাদের দেয় অর্থ ঘটির জলের মধ্যে ফেলে দেবে। বর প্রত্যেককেই "ডব" বা "জোহার" করবে এবং বসতে-উঠতে একপাত্র করে মদ দেবে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হতে-হতেই রাতের খাবার সময় হয়ে যায়। কন্যাপক্ষকে পাঁঠার বা খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ানোই নিয়ম। খাওয়া শেষে আবার মদ। এরপর বিশ্রাম।

পরের দিন সকালেই আবার মদ দিয়ে আপ্যায়ন শুরু। কন্যাপক্ষের দলকে দু'বার ভাত খাওয়ানো নিয়ম। কাজেই আগের দিন যদি একবারই ভাত খাওয়ানো হয়ে থাকে তাহলে পরের দিন দুপুরে তাদের ভাত খাইয়ে, মদ খাইয়ে তবে রওয়ানা করাবে। রওয়ানা করানোর আগে অতিথিদের সকলের পায়ে ও মাথায় সরিষার তেল ও হলুদ মাখিয়ে দেবে। এর পর বর-কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষের সকলে নিজেদের গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। এই দলের সঙ্গে ঘটকি বা ঘটক অবশ্যই থাকবে।

নিয়ম অনুযায়ী বর কনে এবারে তিন দিন মেয়ের বাড়ী থাকবে। তিন দিন পরে ঐ ঘটকের সঙ্গে বর কনে ঘরে ফিরে যাবে। পাঁচ-সাত দিন পরে মেয়ের দাদা-বৌদি যাবে আনতে, মেয়ে ওদের সঙ্গে চলে আসবে বাপের বাড়ী এবারে সাত-আট দিন মায়ের কাছে মেয়ে থাকবে। এই সময়ে নিয়ম অনুযায়ী জামাই বৌকে নিতে আসবে। এবারে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে। এর পর থেকে যাওয়া-আসা নির্ভর করবে প্রয়োজন এবং পরিবারের কর্ত্তার অনুমতিসাপেক্ষে।

এই হোল সংক্ষেপে পুরানো প্রথায় বিবাহ-ব্যবস্থা। আজও এই প্রথা মর্যাদায় অদ্বিতীয়। যে মেয়ের এই প্রথায় বিয়ে হয়েছে সে আজও আত্মগর্বে গরবিনী।*

এই বিয়ের অর্থনৈতিক দিক—

সাঁওতালদের এই বিবাহ-পদ্ধতি ঐতিহ্যগত। আজকাল এইরূপভাবে বিয়ে হওয়াটা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। বলা যায় এইভাবে ছেলেদের বিয়ে দেওয়াটা বড়লোকী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তার একটু আঁচ নিয়ে দিলাম।

প্রথমেই ধরা যাক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। উভয়পক্ষের প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাদের সকলকে খাওয়াতে হলে—শুধু বরযাত্রী এবং কন্যার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনই হবে শতাধিক। তার উপর আছে যে যার গ্রামের লোক। তাদের অন্ততঃ একটি ভোজ দিতেই হবে। এই ভোজ দিতে হলে একটি পাঁঠা বা খাসি লাগবেই।

---

* এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে মেয়ের মনে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে তার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে লেখক প্রনীত "আলেখ্য" পুস্তকে বর্নিত 'সুর্নী" চরিত্রে।

মদের অঢেল ব্যবস্থা রাখতে হয়। সে খরচও কম নয়। তারপর আছে ধুতি, শাড়ী-মার্কিন ইত্যাদি বস্ত্র। একপক্ষে শাড়ী লাগবে কমপক্ষে সাতখানি, ধুতি দু'খানি, মার্কিন পনের-ষোল গজ। আর একটি মোটা খরচ বাজনদারদের জন্য। এই দলে চার-পাঁচ জন লোক থাকবে। এদের উপস্থিতি অপরিহার্য। এদের দিতে হবে একখানা পাঁচ হাত মার্কিন, দুই থেকে তিন শলি † চাল, একটা পাঁঠা বা শুয়োর, নগদ চল্লিশটা টাকা। এগুলি বাজনদার বাড়ী নিয়ে যাবে। এছাড়া তার চার-পাঁচ জনের দলটির চারদিন খোরাকি দিতে হবে। হিসাব : মাথাপিছু এক সের চাল ; দু'বেলায় দুসের অর্থাৎ দিনে আট-দশ সের চাল। রোজ দুটি করে মুরগি এবং দু'বেলায় দুই কলসী করে হাঁড়িয়া প্রতিদিন। কনের বাড়ীর বাজনদার থাকবে দু'দিন থেকে তিনদিন। সেই অনুপাতে খরচটি কিছু কমবে অবশ্য। এছাড়াও নিকটস্থ ভাটিখানার মালিককে ছেলের বিয়েতে দিতে হবে একটি পাঁঠা, এবং মেয়ের বিয়েতে একটি মুরগি, যেহেতু সে আবগারী বিভাগের কাছে সাঁওতালদের বিয়ের জন্য ঘরেঘরে হাঁড়িয়া তৈরী করার জন্য ছাড়পত্র পেতে সুপারিশ করে। সাঁওতালরা এই বিশ্বাসেই শুঁড়িখানার মালিককে এই নজরানা দিয়ে আসছে।

ওদের জিজ্ঞাসা করে যা উত্তর পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে খুব টেনে-টুনে খরচ করলেও লেগে যায় হাজার খানেক টাকা। বছর খানেক আগে একজন সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলের বিয়েতে খরচ করেছে প্রায় চার হাজার টাকা। কাজেই বিবাহ যখন অবশ্য-ঘটনীয় ঘটনা এবং সাঁওতালরা প্রায় সবাই ভূমিহীন চাষী বা দিনমজুর অর্থাৎ গরীব, তখন বিবাহের বিকল্প ব্যবস্থাগুলিই যে দিন-দিন বহু প্রচলিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

এই বিকল্প ব্যবস্থা গুলির কথাই এবারে বলব।

** এক শলিতে কুড়ি সের।

* এই প্রবন্ধ রচনায় যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে বল্লভপুর ডাঙ্গার 'মুন্নী মেম্বেন'-এর নাম বিশেষভাবে স্মরনীয়।

মানস অভীক্ষা (৪)

ঃ বুদ্ধি-পরিমাপ ঃ

দিপালী বসু *

পূর্বের প্রবন্ধগুলিতে যে সমস্ত বুদ্ধি-অভীক্ষার কথা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়সের ছেলে-মেয়ে বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষাটি (Binet-Standford Revision) অবশ্য দুই বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেও উপযোগী। তবে চার সপ্তাহ বা একমাস বয়স থেকে আরম্ভ করে খুব ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করারও নানান প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমুলক মানক (representative scale) তৈরী করা হয়েছে। তবে এর বেশীর ভাগ অংশকেই প্রচলিত অর্থে অভীক্ষা (Test) বলা সঙ্গত নয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি বা পরিবেশে শিশুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্বাভাবিক শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করে, (longitudinal study) মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচার-আচরণে কি-কি পরিবর্তন লক্ষনীয়, এগুলিকে তার একটি তালিকা (schedule) ও স্বমিতি (nozm) নির্ধারণের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

যে সব শিশুদের ছয় বছর পর্যন্ত বয়স তাদের মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অভীক্ষা তৈরী হয়েছে তার প্রায় সবগুলিরই প্রয়োগ একক ভাবে হওয়া দরকার। এত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষার দলগত প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সব শিশুদের সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, (১) জন্মের থেকে মোটামুটিভাবে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত। একে শৈশবকাল (infant period) বলা যেতে পারে। (২) ১৮ মাস বয়স থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত। একে প্রাক-বিদ্যালয় কাল (pre-school period) বলা যায়। এই ভাগের সঙ্গে সমতা রেখে জন্মের থেকে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের উপযোগী অভীক্ষাগুলিও সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। কতগুলি অভীক্ষা শৈশবকালের শিশুদের উপযোগী; কতগুলি আবার প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের উপযোগী। শৈশব-কালের শিশুরা সাধারণতঃ কথা বলতে পারে না। কাজেই তাদের পরীক্ষা করার সময়

---

* ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রী।

ভাষার ব্যবহার সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কোথাও শুইয়ে বা কারুর কোলে বসিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুরা হাঁটতে পারে, টেবিল-চেয়ারে বসতে পারে, অভীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া করতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কাজেই এদের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিষয়গত (objective)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল (Yale) শহরে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের মানসিক বিকাশের উপর নানা গবেষণার পর গেসেল ও তাঁর সহযোগীরা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম গেসেল ডেভালপমেণ্টাল সিডিউলস্ (Gesell Developmental Schedules) প্রকাশ করেন। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ৪ থেকে ৫৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য (Infant Schedule)। দ্বিতীয়টি ১৫ মাস থেকে ৭২ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। এই দুটি অভীক্ষাতেই আবার চারটি দিক থেকে শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। (১) ক্রিয়াজ আচার-আচরণ (motor behaviour) (২) প্রতিযোজক আচার-আচরণ (adaptive behaviour) (৩) মনের ভাব প্রকাশকারী আচার-আচরণ (language behaviour); (৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচার-আচরণ (Individual—Social behaviour)।

(১) ক্রিয়াজ আচার-আচরণের মধ্যে সাধারণ দেহজ নিয়ন্ত্রণ থেকে সূক্ষ্ম ক্রিয়াজ সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা, মাথার ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা, কোন জিনিষ ধরার চেষ্টা বা কোন কিছুকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখা, জিনিষ-পত্র নিয়ে নাড়া-চাডা করা ইত্যাদি আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(২) প্রতিযোজক-আচরণের মধ্যে কোন বস্তুকে ধরার উদ্দেশ্যে শিশু চোখ ও হাতের মধ্যে কতটা সমন্বয় সাধন করতে পারে তা লক্ষ্য করা। শিশুর সামনে নানা প্রকার খেলনা যেমন রং-বেরঙের কাঠের টুক্‌রা, ঝুমঝুমি ইত্যাদি নাড়া-চাডা করে শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়ে থাকে।

(৩) তৃতীয় প্রকার মূল্যায়নে মনের ভাব প্রকাশের জন্য দেখা যায় ও শোনা যায় এইরূপ সমস্ত রকম প্রচেষ্টাকেই এই ধরণের আচরণের মধ্যে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের মুখভাব (facial expression) অঙ্গভঙ্গী করা, নানা প্রকার শব্দ করা, কথা বলার ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্তই পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিশুকে অন্য কেউ কিছু বললে সে কতটা বুঝতে পারে তাও লক্ষ্যনীয় বিষয়।

(৪) চতুর্থ প্রকার মূল্যায়নে যে সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে শিশু বসবাস করে তার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। এই ধরণের আচরণের মধ্যে আছে শিশুর খাওয়া, মলমূত্র-ত্যাগ, খেলা, আয়নায় নিজেকে দেখে শিশুর প্রতিক্রিয়া, কোন লোককে দেখলে শিশুর হাসা বা অন্য কোন রকম ভাবে সাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

গেসেল (Gesell) তার তালিকায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সের শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুংখানুপুংখ বিবরণ দিয়েছেন (বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে ছবি এঁকে)। এই তালিকার সঙ্গে কোন বিশেষ শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে পরীক্ষক শিশুটির মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। অনেক সময় এ ব্যাপারে পরীক্ষককে শিশুর মায়েরও সাহায্য নিতে হয়।

প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের তালিকায় ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪, ৬০ ও ৭২ মাস বয়সের শিশুদের জন্য স্বমিতি দেওয়া আছে। তালিকাগুলি কি ধরণের তা বুঝবার জন্য নিচে ১৫ ও ৭২ মাস বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট তালিকা দুইটির উদাহরণ দেওয়া হল।

১৫ মাস বয়স

(১) ক্রিয়াজ আচরণ :—হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে শিশু কয়েক পা হাঁটতে শিখেছে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। দুটো কাঠের টুকরা সামনে দিলে একটার উপর আরেকটা সাজাতে পারে। কোন বই সামনে দিলে পাতা উল্টাতে পারে।

(২) প্রতিযোজক আচরণ :—দুটি কাঠের টুকরাকে একটার উপর আরেকটা এইভাবে সাজাতে পারে। ফর্মবোর্ডে গোল কাঠের টুকরা সহজেই বসাতে পারে।

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ :—৪ থেকে ৬টা শব্দ বা নাম বলতে পারে। অর্থহীন শব্দ (Jargon) করতে পারে। কোন ছবি দেখালে তাতে হাত চাপড়ায়। কুকুর বা নিজের জুতো ইত্যাদি দেখালে পারে।

(৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচরণ :—বোতলে খাওয়া বন্ধ করেছে। মলত্যাগের উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। নিজে প্রস্রাব করে প্যান্ট ভেজালে তা দেখাতে পারে। কেউ যাওয়ার সময় 'টা-টা' ইত্যাদি বলতে পারে। নিজের চাহিদার

অনেকাংশ বোঝাতে সক্ষম। নিজের খেলার জিনিষ মাকে বা অন্য কাউকে সময়-সময় দিতে চায়।

৭২ মাস বয়স

(১) ক্রিয়াজ আচরণ :—বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে ১২ ইঞ্চি উঁচু থেকে লাফ দিতে পারে। ঘুরে ঢিল ছুঁড়তে পারে। চোখ বন্ধ করে এক পায়ে দাঁড়ায়। দেখে দেখে ডায়মণ্ড আঁকতে পারে।

(২) প্রতিযোজক আচরণ :—কাঠের টুকরা দিয়ে তিনটা পর্যন্ত সিঁড়ি বানাতে পারে। হাত, পা, গলা, ঘাড় ইত্যাদিসহ জামা-কাপড় পরা মানুষ আঁকতে পারে। নয়টা টুকরা জোড়া দিয়ে অসম্পূর্ণ মানুষ সম্পূর্ণ করে। পাঁচরকম ওজনের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। ছবির হারানো অংশগুলি নির্দেশ করতে পারে। চারটা সংখ্যা বললে তা পুনরাবৃত্তি করতে পারে। ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতে পারে।

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ :—এই অংশটি বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার অনুরূপ।

(৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচরণ :—জুতার ফিতে বাঁধতে পারে। সকাল-বিকাল, ডানদিক-বাঁদিক ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যার গণনা করতে পারে।

পরবর্তীকালে নানা গবেষণার পর গেসেলের তালিকাগুলিকে মনোবিদগণ পুরোপুরি সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। শিশু চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, নিয়মমাফিক শিশুকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন গেসেলের তালিকাগুলিকে তারই বিস্তারিত ও পরিমার্জিত রূপ বলা যেতে পারে। একেবারে শৈশব অবস্থায় শিশুদের যেসব স্নায়ু-সংক্রান্ত ত্রুটি বা দেহগত কারণে তাদের আচরণে যে সব অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায় তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষার (medical examination) প্রতিকল্প হিসাবে গেসেলের তালিকাগুলি ব্যবহৃত হয়।

ক্যাটেল (Cattell) কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-বুদ্ধি মানককে (Cattell Infant Intelligence Scale) মনোবিদগণ ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি

সন্তোষজনক হাতিয়ার হিসাবে গন্য করে থাকেন। এটিকে ১৯৩৭ সালের ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড-বিনে সংশোধিত অভীক্ষাটির (Standford-Binet Revision) L রূপের (L form) নিম্নমুখী সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে। এই মানকটি ২ থেকে ৩০ মাস বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি তৈরী করার সময় ক্যাটেল ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড-বিনের সংশোধিত অভীক্ষাটি ছাড়া গেসেলের অভীক্ষা এবং ছোট শিশুদের মানসিক-বিকাশ মুল্যায়ণের উদ্দেশ্যে—প্রচলিত অন্যান্য অভীক্ষার সাহায্য নেন। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলের অভীক্ষাটির অন্তর্গত পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট আছে। ১ বছর বয়স পর্যন্ত ১ মাস অন্তর-অন্তর, ২ বছর বয়স পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর-অন্তর এবং তার পরের বয়সের জন্য ৩ মাস অন্তর-অন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা নির্দিষ্ট করা আছে। প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৫টি করে পরীক্ষা এবং ২/৩টি করে বিকল্প পরীক্ষা নির্দিষ্ট করা আছে। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলির কোনটিতেই সময়-সীমা ধার্য করা নেই। ছোট শিশুরা কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। কাজেই সময়-সীমা নির্দিষ্ট করা থাকলে অনেক বুদ্ধিমান শিশুরও মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন ঠিক মত হবে না। তবে বেশীর ভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষাগুলি দিতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে।

গেসেলের অভীক্ষা ও বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার জন্য সাধারণতঃ যে সব জিনিষ-পত্রের প্রয়োজন, ক্যাটেলের অভীক্ষাটির প্রয়োগের জন্য মোটামুটিভাবে সেইসব জিনিষ-পত্রেরই প্রয়োজন। একেবারে ছোটবয়সের শিশুদের জন্য বেশীর ভাগ পরীক্ষাগুলিই প্রত্যক্ষজ (perceptual)। যেমন, কোন ঘণ্টার ধ্বনি বা কোন লোকের গলার স্বর শিশু নজর করে শোনে কিনা, সামনে কোন রিং বা ঝুমঝুমি দোলালে বা কেউ শিশুর সামনে দিয়ে চলে গেলে চোখ ঘুরিয়ে তা সে অনুসরণ করে কিনা, চামচ বা কাঠের টুকরা সামনে দিলে শিশু তা লক্ষ্য করে কিনা, নিজের হাতের আঙ্গুল দেখে কিনা ইত্যাদি। শিশু তার নিজের মাথা তুলতে পারে কিনা, নিজের হাতের আঙ্গুল নড়া-চড়া করতে পারে কিনা, এক হাত থেকে আরেক হাতে জিনিষ-পত্র নিতে পারে কিনা ইত্যাদি কয়েকটি ক্রিয়াজ (motor) পরীক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগুলিও ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে এবং ভাষার ব্যবহারও বাড়তে থাকে। এই স্তরে কাঠের টুকরা, বিভিন্ন প্রকারের ফর্মবোর্ড, নানা ধরণের চামচ, পুতুল ও নানা প্রকারের খেলনা পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। একটু বেশী বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এইসব খেলনা ব্যবহারের জন্য মৌখিক নির্দেশও দেওয়া হয়ে থাকে। কোন বস্তু দেখে বা কোন জিনিষের ছবি দেখালে তার নাম বলা, পরীক্ষক কোন জিনিষের নাম বললে তা ছবিতে খুঁজে বার করা ইত্যাদি পরীক্ষাগুলিও একটু বেশী বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

এই অভীক্ষাটির মুল্য-স্থিতি পদ্ধতি (Scoring method) অনেকটা বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার অনুরূপ। প্রত্যেকটি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সাফল্যাঙ্ক দেওয়া আছে। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলও মূল বয়সের (basal age) ব্যবহার করেছেন। মূল বয়সের সাথে শিশু অন্য যে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল তার সাফল্যাঙ্ক যোগ করে মনোবয়স (mental age) নির্ণয় করা হয়। তারপর একে বুদ্ধ্যাঙ্কে পরিণত করা হয়।

১৯৫০ সালের পর থেকে ছোট ও প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নানারূপ অভীক্ষা প্রণয়নের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এর প্রধান কারণ মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুদের বিশেষ শিক্ষার উপর এই সময় থেকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কাজেই এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য পুরানো অভীক্ষাগুলির নতুন করে সংশোধন করা হয় এবং আরও নতুন অভীক্ষার প্রচলন হয়।

প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের জন্য মেরিল-পামার মানস অভীক্ষাটি (Merrill Palmer Scale of Mental Test) ১৯৩১ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে এটির বিস্তৃত সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভীক্ষাটি ১০ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী। এতে ৯৩টি পরীক্ষা সহজ থেকে কঠিন এই ভাবে সাজানো আছে। এই পরীক্ষাগুলি নির্ধারণ করবার সময় শিশুদের আগ্রহের উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারণ পরীক্ষার ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ বজায় রাখা একটা মস্ত বড় সমস্যা। তবে মেরিল পামারের মূল অভীক্ষাটির একটা মস্ত বড় ত্রুটি হ'ল যে এতে সময়-সীমার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে যেটা শিশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।

একেবারে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষা-প্রয়োগে এবং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয়ের সময় নানা রকমের সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ শিশুদের অল্প সময়ের মধ্যেই কোন জিনিষকে একঘেয়ে লাগে। অনেক সময় ঘুম পায়। কেউ-কেউ আবার নানারকম ভয় পায়। কেউ আবার খুব লাজুক, পরিচিত লোকের সামনেই যেতে চায় না, একটা জিনিসের উপর তারা বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারে না। কাজেই এই সব শিশুদের পরীক্ষার জন্য পরীক্ষককে দক্ষ ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। পরীক্ষার পূর্বে শিশুর সঙ্গে পরীক্ষকের অন্তরঙ্গতা (rapport) স্থাপন করতে হবে। ঠিক মত অন্তরঙ্গতা স্থাপন

করতে না পারলে পরীক্ষার ফলও সঠিক হবে না। তা ছাড়া এই সময়ে পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা বিশেষ করে একেবারে ছোট শিশুদের বেলায় অনেক সময় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ছোট শিশু:দের পরীক্ষা করার সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্য থাকে (১) পরীক্ষার সময় শিশুর মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করা, এই মুল্যায়নের ভিত্তিতে তার ভবিষ্যতের মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে পূর্বসংকেত করা। তবে অধিকাংশ মনোবিদ্‌ই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের পরীক্ষা করে কোনরূপ সঠিক ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব নয়, যদি না ঐ বয়সের গড় শিশুর থেকে শিশুর আচরণ যে কোন দিকে (খারাপ বা ভালো) বেশী রকম পার্থক্য না থাকে। প্রাক্‌-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের পরীক্ষা করে তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন রূপ পূর্বসংকেত করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও মনোবিদ্‌গণ একমত ন'ন। তবে একেবারে ছোট শিশুদের তুলনায় এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিক সাফল্যের সঙ্গে বলা সম্ভব। সব ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক ভবিষ্যত পূর্ব-সংকেত করা সম্ভব না হলেও পরীক্ষার সময় শিশুর মানসিক বিকাশের একটা মোটামুটি ধারণা দিতে প্রচলিত অভীক্ষাগুলির মুল্য কম নয়।

শিশু-সম্পর্কিত প্রবাদ-প্রবচন

রমেশ দাশ *

বিভিন্ন দেশে বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। কে কবে প্রবাদগুলি রচনা করেছিল তা কেউ জানে না। Encyclopaedia Britannica (Vol. 18) এবং Encyclopaedia of the Social Sciences (Vols. 9 &10) গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে প্রবাদগুলির উৎস সন্ধান করা নানা কারণেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রবাদগুলির প্রাচীনত্ব, তাদের ক্রমান্বয় পরিবর্তন, পুরাতন প্রবাদকে কেন্দ্র করে নূতন প্রবাদের উদ্ভব—গবেষণার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদগুলি ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত নয়, সেগুলি গণ-মনের ফসল, বহু মানুষের যুগ্ম-চিন্তার (Collective Thinking) ফলশ্রুতি ; তাদের ভিত্তি জনসাধারণের যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা। যুগ-যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করে, পরখ করে, মানুষ যে সত্য উপলব্ধি করেছে তাই সে প্রকাশ করেছে প্রবাদ-প্রবচনের আকারে, ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে-মুখে প্রবাদগুলি চলে এসেছে, কেউ-কেউ তাদের রূপ বদলেছে, নতুন-নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তারপর মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর তারা লিপিবদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যে স্থায়ী আসর লাভ করেছে। আজও নূতন-নূতন প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বড-বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি ধীরে-ধীরে প্রবাদের মর্যাদা অর্জন করছে, কত অখ্যাত মননশীল মানুষের উক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের নিজস্ব আবেষ্টনীর সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে-ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়ে চলেছে কেউ তার খোঁজ রাখছে না।

The Oxford Dictionary of English Proverbs এবং The Oxford Dictionary of Quotations প্রবাদ-প্রবচনের দুটি মহামূল্য সংকলন গ্রন্থ। বিচিত্র বিষয়ের উপর অজস্র প্রবাদ ও প্রবচনের এই সংগ্রহ ও সমন্বয়চেষ্টা শুধু প্রশংসার্হ নয়, রীতিমত বিস্ময়কর। বর্তমান নিবন্ধে শিশুসম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ ও প্রবচন এই দুটি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য

---

* অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ)

সুস্পষ্ট। মনোবিদ্‌গণ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে যে সত্য আবিষ্কার করেছেন প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে তারই প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের প্রধান কারণ প্রবাদ-প্রবচনগুলি হঠাৎ গড়ে ওঠেনি;—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই, অর্থাৎ সুদীর্ঘ সযত্ন পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পুনঃ-পুনঃ পরখ (Verification)-এর ভিত্তিতেই তাদের সৃষ্টি।

সত্যিকারের ভালবাসার অনুভূতি আপন সন্তানকে কেন্দ্র করেই মানুষ লাভ করতে পারে। পশু-পাখী মানুষের ভালবাসা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যতটুকু বোঝে তাও প্রকাশ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া ভালবাসার সার্থক বিনিময় সমগোত্রের মধ্যেই সম্ভব। বড়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তাই দুজন বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ হওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শিশুর কমনীয় নির্ভরতা, বিশেষ করে আপন সন্তানটির ক্ষেত্রে, তার প্রতি বড়দের ভালবাসাকে উৎসারিত করে। মাতাপিতার ভালবাসা শিশু স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অজস্র ভালবাসা দিয়ে তাঁদের নন্দিত করে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত ভালবাসা যে কী তা আমরা বুঝতে পারি। তাই বলা হয়েছে—He that has no children knows not what is love. এই কথাটিই আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নীচের প্রবচনটিতে—

So for the mother's sake the child was dear,
And dearer was the mother for the child.

মাতাপিতার ভালবাসা শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এই ভালবাসা যদি অন্ধ হয়, যদি অসংযত হয়, তাহলে তা শিশুর চরিত্রে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাকে বিপথগামী করবে, এমন কি কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হতে পারে। A child may have too much of his mother's blessing (Mothers are oftentimes too tender and fond of their children who are ruined and spoiled by their cockering and indulgence); Love is a boy, by poets styl'd, then spare the rod, and spoil the child এবং Go practise if you please with men and women : leave a child alone for Christ's particular love's sake ! So I say—এই ধরণের প্রবাদ-প্রবচনগুলির এটাই মূল বক্তব্য।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বর্তমানের মধ্যেই নিহিত থাকে। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতে সে কেমন হবে তার আভাস পাওয়া যায়।

শিশুকে ঠিক ঠিক মতো পরিচালনা করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। The child is father of the man; the childhood shows the man, as morning shows the day, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু পরিচালনার গুরুত্বের ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করছে।

শৈশবকালই অভ্যাস গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল সময়। এ সময় মনটি থাকে কোমল, সংবেদনশীল, এবং গ্রহণক্ষম। তার বিচারশক্তি অপরিপক্ব থাকে বলে শিশু যে সব বয়স্কদের ভালবাসে তাদের নির্দেশ নির্বিবাদে মেনে চলবার চেষ্টা করে। তাই বড়দের উচিত এই সময়ই শিশুদের মধ্যে উপযুক্ত অভ্যাস এবং মনোভঙ্গির সৃষ্টি করা শৈশবে মানুষ যে রকম শিক্ষালাভ করে সারা জীবনে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জন্যই মনঃসমীক্ষকগণ জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পণ্ডিত-প্রবর চাণক্যের "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"—উপদেশটির তাৎপর্যও তা-ই। Give me a child for the first seven years, and you may do what you like with him afterwards এবং Train up a child in the way he should go : and when he is old, he will not depart from it—এ দুটি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমরা সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

Children pick up words as pigeons peas, and utter them again as God shall please—এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর বিস্ময়কর অনুকরণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। শিশু বড়দের অনুকরণ করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শুধু ভাষাই শিক্ষা করেনা; আচার-আচরণ, হাব-ভাব, চিন্তার ধরণ-ধারণ প্রায় সব কিছুই আয়ত্ত করে থাকে। সুতরাং শিশুর সঙ্গে বড়দের আচরণ যথেষ্ট সংযত ও সুন্দর হওয়া দরকার। এই প্রবাদটির অন্যতম তাৎপর্যটি হলো শিশুর সরলতা। সে যা শোনে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করবার ক্ষমতা তার থাকে না বলে সহজেই তা প্রকাশ করে ফেলে। সুতরাং শিশুদের সম্মুখে গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা করা সঙ্গত নয়। What children hear at home soon flies abroad এবং Children and fools cannot lie—এই দুটি প্রবাদ বাক্যের বক্তব্যটিও অনুরূপ।

শিশু সদানন্দময়। সামান্য জিনিসেই সে তৃপ্ত। Children and fools have merry lives; Behold the child, by nature's kind law, pleased with a rattle, tickled with a straw, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু-চরিত্রের এই সহজ সন্তুষ্টির দিকটি তুলে ধরেছে।

When children stand quiet, they must have done some ill—এই প্রবাদ-

টির মধ্যে শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অবিরল চঞ্চলতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শিশু এক মুহূর্তও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। তার মধ্যে বিকচমান অজস্র 'প্রেরণা' তাকে সর্বদা চঞ্চল করে রাখে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখলেই বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই কোন একটা নিষিদ্ধ কর্ম করে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

Around the child bend all three sweet graces ; Faith, Hope, Charity.

Around the man bend other faces, Pride, Envy, Malice, are his graces—শিশু সহজে বিশ্বাস করে ; আশা পোষণ করে ; তার আসক্তি কম, তাই এ মুহূর্তে যে বস্তুটার জন্য সে ব্যাকুল, পর মুহূর্তেই সেটার প্রতি তার মোহ আর থাকেনা। সে যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে অহমিকা, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিস্তার ঘটে, কিন্তু সরলতা হ্রাস পায়। তাই বলা হয়—In wit a man ; simplicity a child.

বড়দের আবেগ-জীবনে শিশুদের স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সান্নিধ্য আমাদের মনের গুরুভার লাঘব করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে। Home they brought their warrior dead কবিতায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে কীর্তিত হয়েছে। মৃত যোদ্ধাকে দেখে শোকাকুলা পত্নী যখন বেদনায় নিস্পন্দ, নির্বাক তখন একমাত্র আপন সন্তানকে দেখেই অজস্র অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর মনের স্বাভাবিক অবস্থা। তাই একটি প্রবচনে বলা হয়েছে—In sorrow thou shalt bring forth children.

"ভাবি যা হারিয়ে গেছে হারায়নি তা"—যে শৈশব আমরা দূর অতীতে ফেলে এসেছি তার প্রভাব, তার সুখ-স্মৃতি আজও আমাদের মধ্যে অক্ষুন্ন। তাই কবি বলেছেন—

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky ;
So it was when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old,
Or let me die !

শৈশব-স্মৃতি, শৈশবের রুচি, শৈশবের সুখ সারা জীবনের অমূল্য সম্পদ ; আমাদের

অবকাশ মুহূর্তগুলিকে, আমাদের একান্ত নিজস্ব দুনিয়াটিকে তারা মধুময় করে রাখে। তাই শৈশবকে আমরা ভুলতে চাইনা, ভুলতে পারি না।

আজকের সদা চঞ্চল আনন্দময় শিশুটি কালক্রমে বড় হয়ে জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হবে একথা চিন্তা করে কবির আক্ষেপের অন্ত নেই। ব্যথিত চিত্তে তাই তিনি খেদোক্তি করেছেন—

Child of a day, thou knowest not
The tears that overflow thy urn.

কিন্তু সব কিছুরই ভালোমন্দ দুটো দিক আছে। শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে মাতা-পিতার আনন্দ বিস্তার লাভ করে যেমন, তেমনি স্নেহান্ধ মাতা-পিতার প্রশ্রয় লাভ করে শিশু যখন বড হয়ে বদ মেজাজী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন মাতা-পিতার দুর্ভোগের আর লেখা-জোখা থাকে না। এই রকম অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একটি প্রবাদের—Children when they are young make parents fools, when they are great they make them mad. অতএব সন্তান-লালনে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন।

ফ্রয়েড—শিক্ষক ও বন্ধু

হ্যানস্ স্যাক্স

অনুবাদিকা :—

পুষ্পা মিশ্র *

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ফ্রয়েডের কোন গোপন কুকর্ম অথবা এ যাবৎ অজানা কোনো দোষকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করার সৌভাগ্য আমার হবে না। অবশ্য অনেকেই এ আশা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন নি যে, যে মানুষটির চিন্তাধারা ও তত্ত্ব রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছে, যাঁর নামটাই তাঁদের সুকুমার নৈতিক-চেতনাকে অপমানিত করার পক্ষে যথেষ্ট—তাঁকে নিশ্চয়ই কোন একদিন অত্যন্ত উত্তেজক যৌনতামূলক কার্য-কলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যাবে। এতদিন ধরে তাঁরা প্রায় নিষ্ঠুর রূপেই নিরাশ হয়েছেন এবং বর্তমান গ্রন্থ বা অন্য কোন সত্যভিত্তিক গ্রন্থ তাঁদের এই দুঃখ প্রশমিত করতে সাহায্য করবে না। আমি আপনাদের সম্মুখে শুধু কতকগুলি চারিত্রিক প্রলক্ষণ তুলে ধরব—এমন প্রলক্ষণ যেগুলো তাদের অসাধারণ মানবিকতার জন্য কোন গল্প-বইয়ের বিষয়-বস্তু হতে পারে না ; এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেগুলির সাহায্যে একটি নির্জীব ছবি আর একটি প্রকৃত মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য হবে। বস্ওয়েলও তো তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এমন কোনো তথ্য প্রকাশিত করেন নি, যার দ্বারা আমরা ভাবতে পারি যে জনসন কখনও খুন করেছিলেন, অথবা যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমি ফ্রয়েডকে কখনও study করি নি এবং তাঁর মনকে কোন সুসম্বদ্ধ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু রূপে চিন্তা করি নি। তাঁর জীবিতকালে এটা আমার নিজের কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছে এবং এখন তাঁর মৃত্যুর পরেও আমার তাই মনে হয়। যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, "আপনি তাঁর সম্বন্ধে কি জানেন?" অথবা, "যে অন্তর্দৃষ্টি আপনি অর্জন করেছেন, তার মূল্য কি?" —তাহলে আমি তাঁদের বলব, "আমি বিশ্বাস করি যে, যে অসাধারণ অনুকূল সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি। আমাদের সম্পর্কের কালগত পরিধি প্রায় ত্রিশ

---

* মনঃসমীক্ষিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়া।

বছর, এবং এই সময়ের মধ্যে আমি প্রথমে তাঁর ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলাম, পরে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছি, তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির একজন রূপে পরিগণিত হয়েছি, তাঁর গৃহের একজন নিয়মিত অতিথি হয়েছি এবং সর্বশেষে তাঁর collaborator এবং সঙ্গী হয়েছি এবং এই সমস্ত সময়টুকু ধরে, তিনি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন। এটা কি যথেষ্ট নয় ?"

আমার তো যথেষ্ট বলেই মনে হয়—অবশ্য যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়। পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ এবং সেগুলিকে সদ্ব্যবহার করার পূর্ণতম ইচ্ছাও কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণ উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু একটি সৃষ্টিশীল মন, যেখানে অস্বাভাবিক শক্তিগুলি বিস্ময়কার ফলোৎপাদনে নিরত—তাব গ্রন্থিমোচনে মনোবিজ্ঞানীরাও সাধারণ মানুষের মতই অসহায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় সহজাত ক্ষমতার গোপন প্রবৃত্তিগত দক্ষতার। এই দক্ষতা ফ্রয়েডের বহুল পরিমাণে ছিল। মনঃসমীক্ষণের পথে অগ্রসর হওয়ার বহু পুর্বেই, তাঁকে নিশ্চিত রূপে সহজাত মনোবিজ্ঞানীরূপে গণ্য করা যায়। তাঁর case history গুলি, 'প্রবৃত্তি' 'গূঢ়ৈষা' বা 'অবদমনে'র সমষ্টিমাত্র নয়। তাদের বিষয়ীরা সত্যকার, প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ-রূপেই আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। মহৎ কোন শিল্পীর রচিত চরিত্রের মত, আমরা যেন পৃথকরূপে তাদের চেহারা এবং অনুভূতির প্রকাশ মানসচক্ষে দেখতে পাই; তাদের অভ্যাস এবং ধরণ-ধারণ, তাদের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা ও ঘৃণা, আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল দাবী করে। শিল্পী এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে এই নিকট সাদৃশ্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক অথবা বিস্ময়জনক নয়। লেখকের দ্বারা কোন নতুন চরিত্র সৃষ্টি এবং মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা সেই চরিত্রগুলিকে প্রকৃত মানুষের ছাঁচে ফেলে পুনরায় সৃষ্টি করা —দুটিরই উৎস মূলতঃ একই। সুতরাং বলা যায় যে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী অথবা জীবনীকারকে বিজ্ঞানী যেমন হতে হবে, তেমনি শিল্পীও হতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পী হলেও চলবে না—তাহলে ক্ষুদ্র লেখক—যাঁরা মনস্তত্ত্বের শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন—তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য থাকবে না।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ছবি আঁকতে গিয়ে ফ্রয়েড-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা—তাঁর শিষ্যের প্রতি কঠিন আদেশ। যাই হোক, আমি আমার ক্ষমতা অনুসারে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রলক্ষণগুলি সংগ্রহ করার এবং বিধিবদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহারের স্মৃতি আমি অনায়াসে মনে আনতে পারি; তিনি কখন কি বলেছিলেন, বা কোন্ পরিস্থিতিতে কি করেছিলেন, শিক্ষক-

রূপে, লেখক রূপে, আবিষ্কারক ও কথোপকথনকারী রূপে, পিতা এবং স্বামী রূপে—তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে অথবা অপরিচিতদের সঙ্গে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন, তা আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এইভাবে তাঁর একটি স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করে, ঈশ্বর যদি সদয় হন, তাকে প্রাণময় করে, লোকসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ চিত্র আবর্জনা স্তূপে পড়ে-পড়ে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের খনন-কার্য্যের প্রতীক্ষায় থাকবে। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, যে-উপাদানের চাবিকাঠি আমার হস্তগত, তা সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য এবং ভবিষ্যতে কোন না কোনরূপে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত।

বর্ত্তমানে, তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, আমি কি তাঁর জীবিতাবস্থার তুলনায় অধিকতর স্বাধীন, বা তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়েছি? আমি তা মনে করি না এবং কামনাও করি না—যদিও তা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হত—অবশ্য এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। বিশেষ এবং ব্যক্তিগত অর্থে নিজেকে তাঁর শিষ্য মনে করার কিছুকাল পরেই, আমি তাঁর প্রতি আমার ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নিশ্চিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এইগুলিই আমার স্বাধীনতার সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে এবং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কালে আমি কখনও সে সীমার উল্লঙ্ঘন বা বিস্তার ঘটাই নি। আমি ঠিক করেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আমি বৈজ্ঞানিক মনোভাব বজায় রাখব এবং শুধুমাত্র ফ্রয়েড বলেছেন বলেই কোন কিছু স্বীকার করব না—কিন্তু আমি আমার মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখব এবং তাঁর মতামতগুলি প্রথম দৃষ্টিতে যতই বিস্ময়জনক ও আকস্মিক বলে মনে হোক না কেন—সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করব। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর মতামতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপেই নিশ্চিত হয়েছিলাম—এবং আমি মনে করি না যে এই নিশ্চয়তা আমার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার অভাব সূচিত করে। মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান এবং এমন একটি তত্ত্বও নেই যেখানে আমি তাঁর মতের প্রত্যক্ষ বিরোধী। অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি তাঁর অনুসরণ করি নি, তার কারণ আমাদের মানসিকতার (temperament) পার্থক্য। তিনি প্রায়ই আমার আশাবাদিতা (optimism) নিয়ে ঠাট্টা করতেন এবং একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তিনি তাঁর জামাতা এবং আমার সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় আহার করেছিলেন, তখন মন্তব্য করেছিলেন, "আজ আমি ভিয়েনার সবচেয়ে বড় আশাবাদী এবং সবচেয়ে বড় নৈরাশ্যবাদীর সঙ্গে আহার করেছি।" কিন্তু যদি তাঁকে নিজেকেই নৈরাশ্যবাদী বলতে হয়, তাহলে বলব, তাঁর নৈরাশ্যের সঙ্গে কখনও কোন অভিযোগ যুক্ত হয়ে ছিল না।

কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে (practical matters) আমার মনোভাব সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আমি মনে করতাম, তর্কাতর্কির বিরক্তির হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া বেশী প্রয়োজনীয়। যদি আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের বিরোধিতা ঘটত—আমি নিঃসঙ্কোচে তা ব্যক্ত করতাম। তিনি সব সময়ই আমার মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ আমায় দিতেন এবং আমার যুক্তি-তর্কগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই সেগুলির দ্বারা বিচলিত হতেন না। তারপরে আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে, সমস্ত যুক্তি-তর্ক ত্যাগ করে, তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করতাম। কোন-কোন ক্ষেত্রে, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী বলে যে-মতবাদ আমি ত্যাগ করেছি. পরে সেটাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু অকারণ যুক্তি-তর্কের ফলে যে সময়টুকুর সাশ্রয় হল—তার জন্য আমি এই ভুলগুলি স্বীকার করে নিতাম। আমি জানতাম যে, তিনি যে-দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য পন্থায় নিজের মতবাদে উপনীত হয়েছেন, সে জটিলতার সঙ্গে অন্যের মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটানো তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। আমার মনে হয়, মহৎ আবিষ্কারকদের ধরণই বোধ হয় এইরূপ।

আমি ভণ্ড বা বিনয়ী না সেজে, যথার্থ সত্য তুলে ধরতে চাই। কিন্তু যেহেতু আমি সুখকর ও অসুখকর—সব রকম তথ্যই প্রকাশিত করতে চাই—আমায় পূর্বাহ্নে একটি স্বীকারোক্তি করতে হবে। এই স্বীকারোক্তি অপেক্ষা স্বকৃত কোন কুকর্মের স্বীকারোক্তি, আমার অহংবোধ ও স্বকাম (self-love) এর পক্ষে কম পীড়াদায়ক হত। কিন্তু যদি এই তথ্যটি প্রকাশিত না করি, তাহলে আমি যা বলতে চলেছি তার সমস্তটুকুই অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন এবং অজুহাতের কালিমাযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হলে, আমার কাজ আমি ইচ্ছানুকুল ভাবে করতে সক্ষম হব না।

আমার স্বীকারোক্তিটি এই : আমি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিশ্বাস করি যে, ফ্রয়েড যে-সকল গুণগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতেন, তার কয়েকটি তিনি আমার মধ্যে পান নি। আমাদের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তার মধ্যে একটা কিছুর অভাব ছিল—এমন একটা কিছু যা একই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তরঙ্গতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমি এখানে আমাদের বৌদ্ধিক স্তরের পার্থক্যের কথা বলছি না; অথবা যে-বিশাল ব্যবধান সাধারণ-মন থেকে প্রতিভাবান-মনকে পৃথক করে, তার কথাও বলছি না। এই ব্যবধান সম্পর্কে আমি সর্ব্বদা সচেতন ছিলাম, এবং এই ব্যবধানকে আমি শিক্ষক এবং চিরন্তন শিষ্যের সম্পর্কের অপরিহার্য্য

অংশরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই বিশিষ্ট গুণাবলী—যা আমার ছিল না—তিনি অন্যের মধ্যে পেয়েছিলেন এবং তাঁরাও আমারই মত তাঁর শিষ্যের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন : ফেরেঞ্জী (Ferenczi) ও এ্যাব্রাহাম (Abraham) এবং নিশ্চিতরূপে র‍্যাঙ্ক (Rank) (যতক্ষণ পর্য্যন্ত না র‍্যাঙ্কের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে)। পরবর্ত্তীকালে, হয়ত অধিকতর মাত্রায়, তিনি এইগুলি তাঁর কন্যা অ্যানার মধ্যে পেয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে কখনও কোন কথা বলেন নি, কোন সুদূরতম ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন নি ; যাঁরা তাঁর নিকটতম, তিনি কখনও তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ন করতেন না অথবা কোন পক্ষপাত প্রদর্শন করতেন না, কিন্তু আমাকে তিনি যে-স্থান দিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ প্রণিধানযোগ্য নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও নিজেকে তাঁর অন্তরঙ্গদের পর্য্যায়ে ফেলাটা বিস্ময়জনক মনে হবে। তবু নিঃসন্দেহে আমি তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলাম। তিনি ছাপার অক্ষরে এবং তাঁর লেখায়, সর্ব্বসমক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাঁর বন্ধু বলে স্বীকার ও সম্বোধন করেছেন, এবং বহু ব্যাপারে আমার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা প্রদর্শিত করেছেন। এর কারণ প্রদর্শনের পক্ষে সম্ভবতঃ আমি যোগ্য ব্যক্তি নই, তবে কয়েকটি বোধ হয় আমি তুলে ধরতে পারি। মনঃসমীক্ষণ যখন সকলের আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল, এবং যখন মনঃ-সমীক্ষণকে মানসিক বা যৌন অথবা দুষ্কর্ম বিকৃতিরূপে গণ্য করা হত—তখন যাঁরা মনঃসমীক্ষণের রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতি ফ্রয়েডের অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল—প্রায় বলা যায়, তাঁদের প্রতি তাঁর মনে এক 'নরম স্থান' ছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন মন:সমীক্ষণ লাভজনক ও ফ্যাশানেবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের প্রথমে নিজেদের যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল—"inner circle"টি সম্পূর্ণরূপে পূর্বেকার বন্ধুদের নিয়েই গঠিত ছিল।

যখন ভাঙ্গন ও গোপন দলাদলিশুরু হয় তখন আমার পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা তাঁর নিকটে অত্যধিক মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছিল। "বিজ্ঞানের স্বাধীনতা" বা অনুরূপ বিরাট-বিরাট শব্দে আবরিত ক্ষুদ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির তুলনায়, আমি নিজেকে তাঁর শিষ্যরূপে পরিগণিত করা শ্রেয়স্কর মনে করেছি বলে তিনি যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, বৌদ্ধিক সততায় উপনীত হবার আমার প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং এই আস্থার ফলেই তিনি আমার প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তৎসহ যুক্ত কিছু শিশুসুলভ আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখতে পেরেছিলেন। আমার পড়া-শুনার পরিধি তাঁর মত এত বিশাল না হলেও, আমাদের গোষ্ঠির সাধারণ সভ্যদের তুলনায় অধিক প্রসারিত ছিল এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর ও আমার আগ্রহ ও কৌতূহল একই ধরণের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গে তিনি শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসের কিছু-কিছু প্রায় অজানা পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। আমার জ্ঞানের সুসম্বদ্ধতা ও বিধিবদ্ধতার অভাবজনিত ত্রুটি আমি আমার প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গমের দ্রুত ক্ষমতা দিয়ে অনেকাংশেই

পূরণ করে দিতে পারতাম। আর প্রথম দিককার সেই অবহেলা ও একাকীত্বের দিনগুলির কথা যদি বলতে হয়—তাহলে বলব যে অন্ধদের মধ্যে কানা-ই রাজা হয়ে বসেছিল।

আশাকরি, আমি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছি, যে আমার কোন কথা বা কাজ তাঁর আর আমার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। হয়ত আমি কখনও-কখনও তাঁর রাগ বা বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়েছি—কিন্তু তিনি জানতেন যে আমি কখনও সচেতন-ভাবে তাঁকে আঘাত দেবার জন্য কিছু করি নি। অতএব, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ক্ষমা করেছেন। কেবলমাত্র একবার আমি ইচ্ছে করে, ক্রমাগত এমন একটি কাজ করেছিলাম যা তাঁর মনঃপূত ছিল না। কাজটি প্রায় শেষ হয়ে যাবার সময়, তিনি তাঁর মনোভাব আমায় জানিয়েছিলেন—মাত্র তিন-চারটি শব্দে অত্যন্ত মৃদুস্বরে, প্রায় স্বগতোক্তির মত। এই শব্দগুলি গভীর ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে—একমাত্র কঠোর শব্দ, একমাত্র তিরস্কারপূর্ণ ভাষা যা আমার প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি শেষ হয়ে যাবার পরে, তিনি আমায় ক্ষমা করতে না পারলেও ঘটনাটি ভুলে যেতে পেরেছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁর মনোভাবে এর ফলে কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন আসে নি। আজও আমি এই ঘটনাটির কথা লজ্জিত না হয়ে ভাবতে পারি না—কিন্তু আমার একটি সান্ত্বনা আছে—যে সারা জীবনে একবার—পঁয়ত্রিশ বছরে মাত্র একবার আমি তাঁর তিরস্কারের পাত্র হয়েছি, তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছি—খুব খারাপ রেকর্ড নয়।

সমস্ত বন্ধুত্ব, উৎসাহ এবং আস্থার মধ্যেও আমি আমার যে অভাবটির অস্তিত্ব অনুভব করতাম, তা প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক—আমি যা পারি নি, বা আরও সহজভাবে বলতে গেলে, আমি যা ছিলাম না—তার উপরে ভিত্তি করেই এই অভাববোধটি গড়ে উঠেছিল। আমার চরিত্রে কতকগুলি গুণের অভাবের প্রতি ক্রয়েডের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল—তার দ্বারা অন্যান্যদের তুলনায় আমাকে অনেকটা পৃথকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এঁরা অন্যের মধ্যে সে গুণের যথোচিত মর্য্যাদা দিতেন। অবশ্য, এই গুণগুলি কি—তা ব্যাখ্যা করতে আমি বাধ্য নই। অনুতাপ ও আত্ম-অবমাননার জলন্ত উদাহরণ-রূপে এখানে নিজেকে উপস্থাপিত করতে আমি কণামাত্র ইচ্ছুক নই। "The disciple who leaned on the Lord's breast" রূপে নিজেকে তুলে ধরতে আমি চাই না।

(ক্রমশঃ)

ধৈর্যণা

তরুণচন্দ্র সিংহ *

কালোবাজারী, চোরাই, মুনাফা বাদ ও কর ফাঁকিদারদের বিরুদ্ধে সরকার যে বেশ তোড়জোড় করিয়া কাজে নামিয়াছেন এই খবর প্রায় প্রতিদিনের সংবাদ পত্রেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। নানা স্থানে নাকি বহু ঐ শ্রেণীর লোকেদের গ্রেপ্তার করা ও তাহাদের মজুত অবৈধ তৈজসপত্র ও সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করিবার খবরও পাওয়া যাইতেছে। দেশের জনসাধারণ ইহাতে আনন্দিতই হইবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য-হ্রাস ও ঐ সকল সমাজদ্রোহীদের ছদ্মবেশে পুনরাবির্ভাব যাহাতে না ঘটে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি সরকারের থাকা দরকার। কেবল তাহাতেই সুফল ফলিবে না। যতদিন জনসাধারণ জাগ্রত হইয়া এই সকল অহিতকর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইবে, ততদিন কেবল আইনের সাহায্যে এই অপদেবতার বিলোপ সাধন সম্ভব হইবে না। এই জাতীয় অকল্যাণ সমাজ হইতে দূর করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণের মিলিত চেষ্টা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সরকারের ব্যবস্থায় কিছুদিনের জন্য হয়ত এই দোষ চাপা থাকিতে পারে কিন্তু কিছু দিন পরেই আবার বিভিন্ন আকারে তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইবে। এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, দেশে সরকার আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত সরকার। সুতরাং মূলতঃ আমরাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। অবশ্য একথাও সত্য যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই যাহা খুশি তাহাই করিতে পারি না। অন্য বহু বিষয়ের বিচার-বিবেচনা ইহার সহিত যুক্ত থাকে। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নহে।

আমরাই যদি বহুলাংশে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হই তবে সমাজ জীবনে এই সব অকল্যাণ আসে কোথা হইতে? আমরা নিজেরাই কি তবে এই সমাজ বিরোধী অকল্যাণ চাই? এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, হাঁ। এই সহজ উত্তরটা স্বীকার করিতে আমাদের গর্বিত উন্নত সভ্যতাভিমানী মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক। তবু সত্যকে অস্বীকার করিলেই তাহা অসত্য হইয়া যায় না।

বিষয়টা আরেকটু খুলিয়া বলিলে বুঝিতে সহজ হইবে এবং হয়ত তখন আঘাতটাও এত প্রবল বোধ হইবে না। নানা বিষয় আলোচনা করিবার সময় বহুবার আমরা

---

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

বলিয়াছি যে, মানুষের মনের একদিকে যেমন উন্নতি করিবার, সৎ হইবার, সভ্য হইবার তাগিদ আছে, অন্যদিকে আবার আমাদের মনেই এমন কতকগুলি আদিম বৃত্তি আছে যেগুলি অনিবার কেবল তাহাদের পুরণের সুখের জন্য ছটফট করিতে থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের মনের বাস্তব বোধ, আমাদের নৈতিক বোধ, আমাদের স্বাদর্শ লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি আমাদেরই অপর নানা বোধগুলি ঐ আদিম বৃত্তিগুলির পুরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই দুই মানস-শক্তির প্রভাবে এক নূতন গ্রহণযোগ্য পন্থা নির্দ্ধারণের চেষ্টা আমাদের মনে চলিতে থাকে। বৃত্তিগুলিকে হত্যা করা সম্ভব হয় না। সব বৃত্তি যদি সম্পূর্ণ অবদমিত হইয়া যায় (যাহা কখনই হয়না) তবে আমাদের জীবন অচল হইয়া যাইবে, বাঁচিয়া থাকাই তখন সম্ভব হইবে না। সুতরাং বৃত্তিগুলির নিধন কাম্য হইতে পারে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ দেওয়াও যাইতে পারে না। এই বিরোধের মীমাংসার উপর ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। একটা উদাহরণ দিয়া বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আক্রমবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিকে যথেচ্ছ কাজ করিতে দিলে ব্যক্তির জীবন তথা সমাজ বিপন্ন হয়। ইচ্ছা মত রাগ হইলেই অপর পক্ষকে হত্যা করা যায় না। তেমন আচরণ সমাজের দৃষ্টিতে অন্যায় ও তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধানও সমাজের আইনে ব্যবস্থা করা আছে। এমন কি একজনের প্রাণ বিনাশ করিলে হত্যাকারীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এত করিয়াও আমাদের এই আক্রমবৃত্তিকে যুগ যুগের চেষ্টাতেও এখন পর্যন্ত বিনাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা হাতে না মারিতে পারিলে ভাতে মারি, না পারিলে কথায় মারি, তাহাও না পারিলে নিজের মনে হাজার কল্পনা রচনা করিয়া হত্যা ইত্যাদির মধ্যে নানা প্রকারে আক্রমবৃত্তির যথাসম্ভব আশ মিটাই। ইহাতেও অনেক সময় বৃত্তি নিবৃত্ত হয় না। ক্রমে জমিতে জমিতে এক সময় সাধারণ কোনও সুযোগ পাইয়া ব্যক্তির জীবনে অথবা সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। আবার কোনও সময় সমাজ বা রাষ্ট্রও বিশেষ অবস্থায়, এই আক্রমবৃত্তির প্রয়োগে উৎসাহ দান করে। ফলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নানা বিধ্বংসী অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই আক্রমবৃত্তি অমর। সমাজের কল্যাণে যদি ইহাকে প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তবে এই বৃত্তি একদিন না একদিন ফাটিয়া পড়িবেই এবং সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেই। আমরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তুজগতের উপর আমাদের অধিকার বিস্তার করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঐ আক্রম-বৃত্তি সমাজ-কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিতেছি। রোগের বীজাণু ধ্বংস করিয়াও একই বৃত্তি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিয়া চলিতেছি। লেখাপড়া, খেলা ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতার মধ্যে

ঐ একই বৃত্তির তাগিদ সমাজ-গ্রাহ্য উপায়ে মিটাইতেছি। কাঠ কাটা, মাটি কাটা, পাথর, ইট ভাঙ্গা ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যেই আমাদের আক্রমবৃত্তি কিছু পরিমাণে আমরা মিটাইয়া চলি।

এক আক্রমবৃত্তি সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছি সেই কথা আমাদের অন্য সকল বৃত্তি সম্বন্ধেই সত্য। আমাদের কাম, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিগুলিও সর্বদা আমাদের নির্জ্ঞান মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই আলোড়ন আমরা কে কি ভাবে শান্ত করিতে পারিতেছি তাহার উপরই আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে। এই কথা ঠিক যে প্রথম অবস্থায় বাধা নিষেধ যদি প্রবল না থাকে তবে বৃত্তিগুলি যেন বাগ মানিতে চাহে না। শিশুকে অনেক সময় জোর করিয়াই তাহার ঈপ্সিত বিশেষ আচরণে বাধা দিতে হয়। ক্রমে তাহার বাস্তবজ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকে। তখন নিজে হইতেই শিশু অসুখকর বা কষ্টকর কাজে অগ্রসর হইতে চায় না। পরে আরও বড় হইলে সে বুঝিতে পারে যে, যে-কাজ আপাত কষ্টকর বা অতৃপ্তকর তাহা আখেরে কল্যাণকর হইতে পারে, এমনকি বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে কষ্টকর কাজও করিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রেই তাহার আদিম বৃত্তির সহজ পূরণ বাধা পায়। সমাজ ও সভ্যতা এই সকল নানা রকমের বাধা-নিষেধ ও অবশ্য পালনীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, দাঁড়াইয়া আছে, বাঁচিয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, জীবন ও জগত দুইই গতিশীল। প্রয়োজনও তাই সকল সময় এক থাকে না। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। এই গতিকে রুদ্ধ করিলে জীবনকেই হত্যা করা হইবে। অবশ্য যে কোনও পরিবর্তনই কল্যাণকর এ কথা বলা চলে না। এই খানে বিচারের প্রয়োজন। বিচার করিতে হইলেই অভিজ্ঞতা, অর্জিত জ্ঞান ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়। সেই সব আলোচনার জটিলতার মধ্যে না যাইয়াও আমাদের মূল বক্তব্য সহজে বলিতে চেষ্টা করি। কালোবাজারী প্রভৃতি অসামাজিক চরিত্রের লোকদের আমরাই প্রশ্রয় দিয়া থাকি, আমাদের নিজেদের স্বার্থে, একথা গতবারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই অর্থে কেবল কালোবাজারী, মুনাফাবাজদের দোষ দিলেই চলিবে না। দোষ মূলতঃ আমাদের চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে। কোন কোন মানুষ আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতেছে মাত্র। আমরা নিজেদের লোভ, ভোগ, স্বার্থকে বড় করিয়া তুলিয়া নীতি ও সমাজের বাস্তব কল্যাণকে উপেক্ষা করিতেছি, সমাজ-বিরোধী কার্যে অংশগ্রহণ করিতেছি। সমাজের শত্রু বলিয়া নাম দিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইতে যাইতেছি তাহারাও একই দোষে দুষ্ট।

একজনকে সাধু নাম দিয়া আর একজনকে চোর নাম দেওয়া যায় না। মানসিক অবস্থা বিচার করিলে ইহা একদিকের সত্য। ইহার আরও অনেক দিক আছে, এখানে সেগুলি টানিয়া আনিয়া জটিলতা বাড়াইব না।

আসল কথা দাঁড়ায় আমাদের নীতিজ্ঞান, সমাজ-জ্ঞান এবং বাস্তব কল্যাণ-জ্ঞান প্রভৃতির মান বিশেষ উন্নত নয়, একথাও পূর্বের সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আমাদের সুখের প্রতি লোভ সময়-সময় অন্য সব বিচার-বিবেচনার বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভোগ মিটাইবার তাগিদেই ছুটিয়া চলে। বলিতে হয়, আমাদের বৃত্তিগুলির নিরোধের শিক্ষা আমাদের ভাল হয় নাই। বৃহত্তর কল্যাণের চিন্তা আমাদের মনে তেমন ঠাঁই পাইতেছে না। আপাত ভাল লাগা বা লাভের কথাটাই বড় হইয়া উঠে। ইহার মূলে আত্ম-সর্বস্বতার, আত্ম-প্রীতির (স্বকামের) প্রভাব প্রবল থাকে। এখানে আত্ম বলিতে নিজে ও নিজের এই দুইকেই বুঝায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজটাই প্রধান, নিজের অর্থাৎ নিজের আপন বলে ইত্যাদি, তাহার পরে স্থান পায়। শেষ অবস্থায় 'চাচা আপন বাঁচা' নীতিটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব নহে তাহা বলিতেছি না। যে-কারণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। মোট কথা, নিজের লোভের তাগিদে, স্বকামের তাগিদে যখন নিজের লাভ, নিজের ভোগটাই প্রাধান্য পায় তখন আমাদের নীতি-জ্ঞান চাপে পড়িয়া আর মাথা তুলিতে পারে না। বাহিরের সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তখন যোগ্য শাসনের ব্যবস্থা করিতে না পারে তবে আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে—তাহা অনিবার্য হইয়া উঠে। বাহিরের শিক্ষা যতদিন নিজের মনে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে না ততদিন বাহিরের শাসনের ভার বা দায়েই আমাদের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু বাহিরের সেই শাসন শক্তি যদি দুর্বল হয় তবে আর বাঁচাইবে কে? নিজের মনের বৃত্তিগুলি তখন সুযোগ বুঝিয়া যেমন করিয়া পারে নিজ নিজ ভোগ মিটাইয়া লইতে তৎপর হয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় রোগের মূল বীজাণু এইখানেই রহিয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণের জীবনে যে নীতিবোধ, নিষ্ঠা প্রভৃতি একসময় ছিল তাহা ভাঙিয়া নষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানে আর কোনও নূতন গ্রহণযোগ্য নীতিবোধ বা নিষ্ঠা ইত্যাদির শিক্ষা আমাদের মনে স্থান পায় নাই। সুতরাং কোনও বৃত্তির চাপ আসিলে তাহাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করিয়া দেখিবার অথবা সমাজ জীবনের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। অপর দিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসনও দুর্বল হওয়ায় সমস্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় একদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি সুষ্ঠু ভাবে

প্রয়োগ করা যেমন দরকার অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন একান্ত দরকার। আমরা অ আ ক খ শিখিয়াছি, হয়ত বা বড় বড় পণ্ডিতী কথাও বলিতে শিখিয়াছি কিন্তু জীবন চালনার শিক্ষা আমাদের বড়ই কম। জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করি না, অধীত বিদ্যাকেও জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে শিখি না। ফলে অধীত বিদ্যা কেবল বাহিরের সাজ-পোষাকের মতই আমাদের বহির্বাস মাত্র হইয়া থাকে। জীবনকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের এই অপুষ্ট, দীন জীবনের গ্লানি তাই নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তি ও শিক্ষা এই দুইয়ের উপযুক্ত প্রয়াস ভিন্ন এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার আর পথ নাই।

আমাদের ভোগলিপ্সু মন ভোগ খুঁজিবেই, ভোগ মিটাইতে সর্বদা সচেষ্টও থাকিবে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমাদের বাস্তবজ্ঞান, নীতিবোধ ও আদর্শানুসরণ ইত্যাদি মানসিক দিকগুলিও সক্রিয়, সতেজ ও সুস্থ থাকে তবে ঐ ভোগলিপ্সা কখন, কিভাবে, কত পরিমাণে মিটাইতে পারা সম্ভব ও সঙ্গত এই বিচারও আমাদের মনই করিতে পারিবে। যাহাতে আমাদের মনের সেই শিক্ষা ও শক্তি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে তাহার উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া সেই অনুসারে শিক্ষা ইত্যাদি পরিচালিত করিতে হইবে। শিক্ষা বলিতে কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা বোঝায় না। শিশুর জন্ম হইতেই তাহার শিক্ষা শুরু হয়। সেই শিক্ষা যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে শুভ ফল লাভের আশা করা যায় না। দুঃখের বিষয় এইদিকে আমাদের দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেই চলে। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কমিটি গঠিত হইয়াছে, বিস্তৃত মতামতও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মূল্য কম নহে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাহাও মূল্যবান তথ্য। সেগুলির প্রয়োগ গত ৩০ বৎসরেও সম্ভব হইল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়া যে নকলনবিসদের ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে তাহা দুঃখকর। দেশের পক্ষে ইহার ক্ষতিকর রূপ অতি স্পষ্ট। কিন্তু শৈশব হইতে শিক্ষার সে ভিত্তি স্থাপিত না হইলে পরের শিক্ষাগুলি তেমন করিয়া দৃঢ়ভিত্তিক বলিষ্ঠতা পাইতে পারে না। সেই মূল শিক্ষার দিকে আজও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। ভারতের মত এত বড় দেশের পক্ষে এই শিক্ষাদান যে কত বড় ও জটিল বিষয় তাহা আমরা জানি। তবু যেমন করিয়াই হউক শুরু না করিলে, ক্ষেত্রে সময় মত বীজ বপন না করিলে, ফলের আশা করা যায় কি? এই সহজ তথ্যগুলি বারেবারে জনসাধারণের, বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্র পুরোধাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে। যদি একসময় একজনেরও মনে কিছু সাড়া জাগায় তাহাতেও কিছু কাজ হইবে। একদিন হয়ত একে একে অনেকের মনে এই চিন্তা স্থান পাইবে। আমরা সেই আশাতেই আমাদের সামান্য

শক্তি নিয়োগ করিতেছি। আমাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইলেও তাহা সত্য বলিয়াই প্রবল। একদিন এই সত্য নিজ বলে প্রতিষ্ঠিত হইবেই এই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। সেই শুভদিনকে আমরা বারে বারে আহ্বান জানাই।

উঠ, জাগো, নিজেকে জানো, অপরকে জানাও, কর্ম কর, অন্যকে কর্মে ডাকিয়া আন, ব্রতী হও, অপরকে বৃত করা।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

- লেখকের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, লেখকের অনুরোধ সাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্ প্রিণ্টও দেওয়া হয়।

- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১৪, পার্সিবাগান লেন

কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

সপ্তদশ বর্ষ

চিত্ত

তৃতীয় সংখ্যা

কার্ত্তিক-পৌষ * ১৩৮২

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। নির্বিশেষে তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি অনুসৃত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হইবে না।

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian [illegible] Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and printed by [illegible] Printing Works [illegible] Road, Calcutta-[illegible]